শাল পিয়ালের বন

শক্তিপদ রাজগুরু

অভ্যুদয় প্রকাশ-
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

জুলাই ১৯৫৪

প্রকাশ করেছেন

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ছেপেছেন

কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ছবি এঁকেছেন

মনীন্দ্র মিত্র

তিন টাকা

ডাঃ অমল ঘোষ হাজরা

বন্ধুবরেষু

সভ্য মানুষের পায়ে চলা পথ যেখানে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেইখান থেকে হয়েছে ওদের পথের প্রারম্ভ। নীল আকাশের বুকে অস্পষ্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত দেখা যায় গগনচুম্বী পর্বতসীমা, একটা নয়—একটার পর একটা। ওদের নাম কেউ জানে না, নিজেদের দেওয়া পরিচয়েই ওরা মহান হয়ে উঠেছে। লাল কপিশ প্রান্তরের নিচের দিকে নেমে গেছে শাল মহুয়া পলাশের কুঁকড়ে পড়া জঙ্গলসীমা,...ঢালু প্রান্তর আবার ঘনতর, বনসমাকীর্ণ হয়ে উঠে গেছে দিগ্বলয়-রেখার দিকে। সব কিছুই ওখানে ঢাকা রয়েছে কি যেন এক অজানা রহস্যে।

ওদের দেশে কালবৈশাখী আসে মহাদেবের তাণ্ডব-নর্তনের তালে তালে মেঘডমরুর বজ্রনাদে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করে। ঝড়ের বেগে গৈরিক ধুলো ঢেকে ফেলে আকাশ-বাতাস, দূরপ্রসারী পর্বত-সানুদেশ। বর্ষা আসে কলাপী কেকার কুহুরবে। আসে শরৎ শিশুচাঁদের মনভোলান হাসি নিয়ে জনহীন শালপিয়ালের বনের সুঁড়িপথ বেয়ে। পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে ঝরাপাতার মর্মরে শিহর জাগিয়ে আসে শীত ঋতু; বসন্তও আসে।

বসন্ত আসে অরণ্যের জয়গানে বনভূমি মুখর করে পলাশের ফাগ মেখে তার সর্বাঙ্গে। পিয়াল-বনের কোলে কোলে যূথহারা মৃগী কাজল-কালো চোখে কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়—অশোকের মঞ্জরী-ঝরা বনতলে শশকশিশুর পূর্বরাগ সূচিত হয় কোন্ প্রিয়তমার সঙ্গে ভীরু চাহনির বিনিময়ে।

কুলপলাশ গাছের সংখ্যাই বেশী। ডালে ডালে লাক্ষার সমারোহ, ডুংরীর সকলেই এসেছে বনে লাক্ষা কাটতে। বৎসরের এই তাদের অন্যতম প্রধান জীবিকা। ডুংরীর ছেলেমেয়ে সকলেই সেই সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে কাটারি, বস্তা, ঝুড়ি নিয়ে বার হয়। দুপুর বেলায় দল বেঁধে পাহাড়ি কাঁইজোড়ের ধারে দাকা খেয়ে নিয়ে আবার গাছে ওঠে। পুরুষরা ডাল থেকে কেটে ফেলে দেয় লাক্ষার গুটি, ছেলেমেয়েরা কুড়িয়ে ঝুড়ি বস্তা বোঝাই করে সন্ধ্যার সময় ফেরে আবার ডুংরীর দিকে। ওদের গানের সুরে মুখর হয়ে ওঠে বনতল।

ফুকন মাঝির মত গেছেল খুব কম দেখা যায়। কাঠবিড়ালীর মত লিকলিকে লম্বা দেহটা নিয়ে অবলীলাক্রমে উঠে পড়ে পলাশ গাছের মগডালে! নিপুণ অভ্যস্ত হাতে ছোট ছোট ডালগুলো কেটে ফেলে নিচে। চাপ চাপ লাক্ষা বাসা বেঁধেছে! নীচে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছাগলগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে, কচিকচি পাতাগুলো মসমস করে চিবিয়ে চলেছে তারা।

হঠাৎ সোয়ী মুখ তুলে চাইল। পাহাড়ি পথটা বেয়ে একটা জীর্ণ ঘোড়ায় চেপে দড়ির লাগাম লাগিয়ে আসছে লোকটা। টিং টিং করছে থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট—মাথায় একটা সোলার টুপি, যেন তেলে আর রোদে পেকে উঠেছে, ছিন্নপ্রায় কোটটার বটনহোলে এক থগা ঘেঁটু ফুল বসানো। একটু হাসিতে মুখটা ভরে ওঠে, তামাটে রং গোঁফগুলো নড়ে ওঠে। মাথা থেকে টুপিটা খুলে ওদের সম্ভাষণ জানায়।

—"কিরে!"

দেখতে দেখতে তার চারিপাশে সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের একটা জটলা জমে যায়, কে যেন ওর ঘোড়ার দড়িটা ধরে ঘোড়াটার মুখের সামনে এগিয়ে ধরে কতকগুলো কুলপাতা। ওদিকে আরুলাহান কোটের পকেট থেকে বার করতে শুরু করেছে কাঁচের মালা, পাথরের

টাপ, হিংলাজের নাকছাপি। মেয়েগুলো হাসাহাসি করছে। এক দিক থেকে কয়েকটা চুরুটও বার হয়! রুকন নিবিষ্ট মনে একটা চুরুট ধরিয়ে টেনে চলেছে।

মেয়েরা বলে ওঠে—আগে এলি নাই কেনে, দাকা দিতম তুকে!

হাসে আরুলাম্থান—জানব কেমন করে বল্!

হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে—আমাকে ফিরতে হবেক এইবার, দে রে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দে!

ওদিকে দুটো ছেলে ততক্ষণ ঘোড়ার পিঠে পালাপালি করে চেপে চলেছে, ঘোড়াটাও বিনা প্রতিবাদে ওদের অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে নীরবে, প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাই হয়ত তার নাই!

ওদের কোলাহল থেকে আবার বনের মধ্যে ঢুকে গেল আরুলাম্থান। মাঝি মেঝেনরাও আবার ডুংরী ফেরবার আয়োজন করে চলেছে।

সাতাশীর সাঁওতালরা সকলেই জানে আরুলাম্থানের জন্ম-ইতিহাস। এই ডুংরীরই মেয়ে ছিল ওর মা, চিনকুঠিতে কাজ করতে গিয়েছিল কার সঙ্গে রং ধরিয়ে। মনের মানুষটা মারা পড়তেই কলিয়ারির কোন এক সাহেবের ঘরে ঝিয়ের কাজ করতে লেগেছিল। চিরকালটাই মেয়েটা ছিল নষ্টা-প্রকৃতির। তাই বিপদ বাধাতে দেরি হল না। বেজাতের ঘরে থেকে নিজের জাতের সর্বনাশ করেছিল সে।

এই ছেলেটা আজও মায়ের কলঙ্কের ইতিহাস বয়ে চলেছে। হাঁস-পাহাড়ি মিশনারি হোমে মানুষ হয়েছে, থাকেও সেইখানে। কেউ বলে ও খেরেস্তানই হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে তার কি ধর্ম আরুলাম্থানই জানে না। ওটা তার ডাকনাম—পোষাকী নাম একটা আছে, সেটা নেহাৎ সাঁওতালদের জাতেরই।

বুড়ো মাঝি-সর্দাররা তার আসা যাওয়া মোটেই দেখতে পারে না,

কিন্তু ওর প্রাণ-সম্পদে ভরা দরাজ হাসি তরুণ ছেলেমেয়েদের মনে নেশা জাগায়। ডুংরীর বাইরে বনের মধ্যেও তাই ও আসে। প্রাণ খুলে মিশবার জায়গা তাই বেছে নিয়েছে ওরা সমাজের বাইরে—বনের মধ্যে।

সোয়ীও মনের অতলে কোথায় যেন একটা বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করে। ওদের ও কেউ নয়,—এই কথাটাই যেন সকলের মনে বাল্য-কাল থেকেই ওরা অনুভব করে, তবুও কোথায় ঐ আরুলাস্থানের এমন একটা আন্তরিকতা আছে যাকে তারা কোনদিনই অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাই সামান্য উপহার ওর ফিরিয়ে দেবার সামর্থ্য কারুর কোনদিনই হয় নি।

ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম এবং মানভূম জুড়ে বাস করে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর আদিবাসী। বিভিন্ন গোত্র, শ্রেণী এবং পর্যায় এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে, তবে জীবযাত্রার মান এবং জীবিকাসংস্থানের উপায় প্রায় একই; বনজ ফলমূল, জন্তু-জানোয়ার—সম্প্রতি কিছু শ্রেণী চাষবাসও শুরু করেছে। মিশনারিদের কৃপায় যেখানে আলোক পৌছেছে তাদের মধ্যে এসেছে নানা ধরণের জীব। কেউ কেউ একটু-আধটু লেখাপড়া শিখে ওদের শ্রেণীর স্বভাবজাত সরলতাকে ঠকিয়ে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। কলে-কৌশলে কেউ বা সাঁওতাল ওঁরাওদের নিয়ে এসেছে কলিয়ারির কয়লা তুলতে, সাহেবদের আড়কাঠির খাতায় নাম লিখিয়ে তাদের অনুগ্রহ লাভ করে শাঁসালো হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃ বনরাজ্য যা তারা ভোগ করত বিনা রাজস্বে, তাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এমন কি বনের ফল ফসল পর্যন্ত! তারা দোহাই দেয় বোঙার।

এমনি এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে আজ ফুলডুংরীর মাঝিরা।

বনের লাক্ষা আর বিনা পয়সায় কাটা চলবে না। বনকে যেন ডাক করে নিয়েছে!

অন্ধকার ঘিরে এসেছে চারিদিকে। ডুংরীর মধ্যিখানে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ; চারি পাশ তার গোবর দিয়ে নিকোন, মাঝে মাঝে দুএকটা কালো পাথর উঠে আছে। ওদিকে মিটমিট করে জ্বলছে দু'একটা পিদিম। মাদনা বংগার থান। কয়েকজন লোক অন্ধকারে বসে রয়েছে।

বলে চলেছে লটু মাঝি,—বন যদি ইজারা লিতে হয় আমরাই লিব! য'গণ্ডা টাকা লাগে জোট করি দিব!

সি হবেক নাই, যিখান থেকে বন দিবেক সি ঠিঁই এ দুসরা লুক লিয়ে ফেলালছে! বরাকরের স্বরযপ্রসাদ না কুন লুক বটে!

খবরটা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। মটুক মাঝি ধান বিক্রী করতে গিয়েছিল সহরে, সে-ই খবরটা নিয়ে আসে।

নামো ডুংরীর সোন্দর মাঝির ছ্যালাটো ওই যে চাঁদ, সেই নাকি তত্ত্ব-তালাস দিয়েছে ওই লুকটোকে!

স্তম্ভিত হয়ে যায় সকলেই। তাদেরই মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্য আর একজন সাঁওতাল ভিন্ন লোককে তাদের হয়ে লাগাবে, এই কল্পনা তারা এতকাল করতে পারে নি!

চাঁদ? তাকে উয়ার বাবা হাঁসপাহাড়িতে নেকাপড়া শিখাইছিল—জাত-গৌয়াতের ভাত কেড়ে লিতে?

রাঙা সর্দার বিস্মিত হয়ে যায়! বুড়ি মেঝেন আর থাকতে পারে না, বলে ওঠে—

হায় হায় গো, পিরথিমে ইবার শুকাই যাবেক! বনের জানোয়ার হয়ে যাবেক, গরুর বাঁটের খির ফুঁরাই যাবেক! আগের লুক হলে

উয়াকে ঠোর মেরেই ফেলাতক! সুরযবংহার তেজ ছারখার করে দিক উয়াকে! হেই মাদনা বংগা···

ধমক দিয়ে ওঠে রাঙাসর্দার,—উটোকে নোড়াটে ধরে দূর করে দিয়ে আয় তো কেউ, নেশা মেরে আইছে ইখানে!

আবার নীরবতা নেমে আসে বটতলায় অন্ধকারের মত ঘন হয়ে। কী হবেক?

মটুক মাঝির কথায় বলে ওঠে সর্দার,—ইবার কেটে ফেলা, পরে দেখা যাবেক!

নামো ধাওড়ার সুন্দর মাঝি সাঁওতাল জাতের মধ্যে একটু স্বতন্ত্র ধরণের। আগে-কালে ছিল বরাকর নদীর ওপারে ঝরিয়ার রাজার বন পাহারাদার। লোকে বলে সেই সময় নাকি বেশ দু পয়সা পেয়েছিল। তারপর এদিকে এসে জমিজারাৎ করে বাসপত্তন করে।

সাতাশীর সর্দার-মেলানিতে এসে প্রথম দিন সে ওদের সঙ্গে মদ খায়নি। কাঁচি মদ খেলে নাকি গায়ে গন্ধ ছাড়ে, আর পোড়া মাংসও তার কাছে বিশ্রী! এই নিয়ে অনেক কথাই উঠেছিল, কিন্তু পয়সার জোরে সব ঢেকে গেছে। সরকারী চৌকিদার ছিল—সেকালের নীল জামা আর কোমরের একটা চামড়ার পটি পরে সে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াত। বুড়ি মেঝেন প্রথমদিন দেখে কোমরে হাত দিয়ে আর একটা হাত মাথায় তুলে নেচে দিয়েছিল—উরু রু রু র র তাক্ কিটি তাক কিটি তাক্!

বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সুন্দর। ধমকে উঠেছিল রাঙাসর্দার, অতিথ্ আইছে আহ্বান কর, চুটি জল লিয়ে আয়, তালন্ন ইসব কি?

হাসে বুড়ি—তুর বিয়াই আইছে রে!

সোয়ী তখন এইটুকু। সুন্দর চেয়ে থাকে কালো কুচকুচে মেয়েটার দিকে। চাঁদের সঙ্গে মানাবে মন্দ নয়।

চাঁদকে প্রথম যেদিন সে পাঠায় হাঁসপাহাড়িতে পড়তে, সেদিন আশপাশের ডুংরীর অনেকেই বাড়ি বয়ে বলতে এসেছিল, ইটো ভাল হচ্ছে সোন্দর ?

লিখাপড়া শিখবেক, খারাপটি হল কুনখানে ?

বয়ে যাবেক হে ! সুন্দর কারুর কথায় কান দেয় নি। তার সামর্থ্য আছে, ঘরে ধান আছে জমি জারাৎ আছে, পড়াবে। সঁাওতাল বলে কি মানুষ হবেনা, চিরকালই বনে বনে ঘুরতে হবে বাঁশ কাঁড় নিয়ে !

প্রথমে কথা বলেনা রাঙামাঝি ! একদিকে সে সাতাশীর সর্দার, তার বাড়িতেই এসেছে ওরা। সঁাওতাল জাতের মধ্যে এসব রেওয়াজ নাই··· যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা জাত দিয়েছে তাই শিখতে পেরেছে, কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে এ জগতে তারা হয়ত ঠকবে, তাই চাঁদকে বাধা দিতে মন চায় না। সুন্দর মাঝি রাঙা সর্দারের কথায় মাথা নাড়ে—

বুল তুমিই বুল সর্দার, কাজটা ঠিক করেছি কিনা !

অন্যায় করেনি রে সোন্দর !

সাতাশীর সকলেই এই মতামতের মধ্যে কোথায় যেন পক্ষপাতিত্বের সন্ধান খুঁজে পায়।

এই চাঁদ বড় হয়ে উঠেছে। আজ লেখাপড়া শিখে সমাজের উপকার না করে নিজের গণ্ডাই বুঝে নিতে শিখেছে। সোন্দর মাঝির বুকের পাটা চিতিয়ে গেছে, সঁাওতাল সাতাশীকে থোড়াই কেয়ার করে ভাবখানা। মাদ্‌না বংহা—হ্বরয বংহা কেউ কিছুই করতে পারবেনা তার।

ছেলের এখন ঘন ঘন যাতায়াত চলছে বরাকরের ধানকল মহাজন হ্বরযপ্রসাদ বাবুর গদ্দিতে—আর ও কয়লা কুঠির সাহেবরাও নাকি তাকে

ভালবাসে। সে-ই পাকচক্র করে মহাজনকে দিয়ে সব বন ডাক করিয়েছে।

মাঝে মাঝে দেখা যায় তাকে সাদা একটা ঘোড়ায় করে সহরের দিকে যেতে—গায়ে পিরান, পায়ে চামড়ার জুতো। বর্ষার দিনে মাঝে মাঝে তেরপলঢাকা জামা আর টুপি পরে যাতায়াত করে। কারণে অকারণে ইদিকে আসে আর মদ খাবার পয়সা বিলিয়ে যায়। বুড়ি মেঝেনের প্রশংসা ধরে না—হুঁ তকি, ছেলে বটে সেঁাদর মাঝির!

সোয়ীর সঙ্গে বিহা হবেক, আমার লাতজামাই হবেক···গলা জড়িয়ে ধরে সিদিন লাচব·· ধিতাং ধিতাং তাং···

মদ পেটে পড়লে ওর মুখের সান থাকেনা—লাজ লজ্জার বালাই দূর হয়ে যায়। রাঙা মাঝি দেখেছে ডুংরীর ছেলেদের চোখে হিংসার আভা। মাঠের কাজ···কাঁড় বাঁশ লিয়ে শিকের, উসব যেন আর ভালো লাগেনা।

···রাত কত জানেনা, বটতলা জনশূন্য হয়ে আসে। পিদিমগুলো নিভে গেছে, একটা পিদিমের বুক জ্বলছে। একা আদিম অন্ধকার-যুগের প্রহরী বসে রয়েছে ওই রাঙা সর্দার, নতুন যুগ আসছে অতীতের অন্ধকার ভেদ করে বুকজোড়া বহ্নিজ্বালা নিয়ে···ওর সব রহস্য শেষ করে দিতে!

কোন্ তিথি জানেনা ছেলেমেয়েরা, নাচের আসরে মেতে উঠেছে। এসব ভাবনা চিন্তা তাদের মনে ছোঁয়া জাগায় না। বুড়ি মেঝেনের ভাঙা গলা অন্ধকার ভেদ করে জেগে উঠেছে···আর একটা সুরও ভেসে আসে—সোয়ীর গলা—ফুকনের বাঁশির সুর ছাড়িয়ে উঠছে। দূর পাহাড়ের মাথায় ডেকে যায় ফেউ···ঘন বটগাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তারকিনী রাত্রির একটুকরো চুমকি-বসানো আঁচল। এলোচুলের অন্ধকারে সর্বাঙ্গ তার আবৃত। তারায় তারায় দীপ্তশিখার বহ্নিজ্বালা

কোন্ পর্বতসীমায় জেগে উঠেছে। গান চলছে পুরোমাত্রায়। জোয়ান ছেলেমেয়েদের মনে নাচের নেশা—সোয়ী যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নোট্‌না মাদলের সোমের মাথায় তেহাই দেয়···চিড়িক্—চিড়িক্—চিড়িক্, ধাকুম তাক্—ধাকুম তাক্!

শীতের শেষ। পাহাড়তলীর বনে বনে পত্রহীন গাছগুলোতে গজিয়ে ওঠে নতুন পাতার সমারোহ। শাল জঙ্গলের ঝরা পাতা এলোমেলো বাতাসের চোটে গড়িয়ে চলে কপিশ প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে—যেন ঘোড়সওয়ারের দল চলেছে দিগ্বিজয়ে। মহুয়া গাছের পাতা ঝরা ডালগুলোতে গজিয়ে ওঠে থোলোথোলো মহুয়া ফুলের কুঁড়ি। রাতের বাতাসে চোখ মেলে চায় তারা·· মাটির ইসারায় ব্যাকুল আবেগভরে ঝরে পড়ে তার বুকে···ঝরাতেই তার আনন্দ·· আনন্দেই তার মধু-জীবনের সমাপ্তি! মাটির বুক বিছিয়ে পড়ে থাকে ফুলগুলো···বন থেকে ছা-বাচ্ছার দল নিয়ে বার হয়ে আসে কুঁদো কুঁদো ভালুক-দম্পতি। প্রাণভরে মহুয়াফুল খেয়ে সারা রাত চাঁদের আলোয় মাতামাতি করে পাহাড়ের নিচে নেশার ঘোরে গড়াগড়ি দিয়ে চেপ্টে পিষে নষ্ট করে দিয়ে যায় ফুলগুলোকে।

ভোর বেলাতে সেদিন সোয়ী, কুন্‌কী, কুচি আরো অনেক মেয়েরা মহুয়া কুড়োতে এসে চীৎকার শুরু করে প্রাণভয়ে।

ভোরের আলো সবে ফুটে উঠেছে ডুংরীর বুকে, পাহাড়ের মাথাগুলো লালচে হয়ে আসছে। যোয়ান-মদ্দ মাঝিরা সকলেই সারারাত নাচ-গানের পর ঝিমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ মেয়েদের চীৎকারে বুড়ো রাঙাসর্দার উঠে পড়ে। তার হাঁকডাকে বার হয় ফুকন—বুধন—নোট্‌না—আরও অনেকে তীর কাঁড় নিয়ে।

সোয়ী, কুন্‌কি সকলেই একটা পলাশ গাছে উঠে পড়ে প্রাণপণে চ্যাচাচ্ছে! নিচে একটা ভালুক···ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে মাটি শুঁকছে আর

পাক দিচ্ছে গাছটার চারিপাশে, মাঝে মাঝে পিছনের দুটো পা গাছে তুলে দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে আবার নামিয়ে নিয়ে কুঁই কাঁই শব্দে নেহাৎ ভদ্রলোকের মত ওপরের দিকে চেয়ে মজা দেখছে। সমানে চীৎকার করে চলেছে মেয়েগুলো।

...ভালুকটা লোক দেখেও পালায় না। ফুকন তীর ছুঁড়তে গিয়ে থেমে গেল—

থাম, থাম তুরো! উটোর নাক ফুঁড়োন রইছে, কারুর পুষা বটে ভালুকটো!

ইতিমধ্যে কাঁইজোড়ের দিক থেকে বার হয়ে আসে একটা সাঁওতাল ছোকরা, দোহারা নিটোল শরীর, গলায় একটা লাল পাথরের মালা, কানে গোঁজা কাঁচা শালপাতার একটা চুটি। চীৎকার করে ওঠে ফুকন—কেন ছেড়েছিস উটোকে! দুব কাঁড়াই শ্যায করে!

হাসে ছেলেটা—বারে—উও খাবেক নাই গাছের দুটো ফুল?

মেয়েগুলোকে যে মেরে ফেলাইত?

উ মস্‌করা করছিল টুকচেন!

আর তু কি পিরিত করতে আইছিস্‌? এগিয়ে আসে সোয়ী।

ওই, তুমি যি টং হয়ে গেইছ! ছেলেটা হাসে।

ফুকন ওর ন্যাকামিতে রেগে যায়, এগিয়ে এসে বলে ওঠে—লিয়ে যা তুর ভালুকটোকে—খবরদার উকে লিয়ে আসবি, ফের যদি কুনদিন ওকে দেখি শ্যায করে দুব—হ্যাঁ!

দিখা য়াবেক কত তুমার কাঁড়ের জোর বটে!

মাথা উঁচু করে বিশাল ভালুকটাকে নিয়ে টানতে টানতে চলে গেল।

সোয়ীর মনে বিস্ময়। ফুকন রাগে গর গর করে। শালুক-চাপড়ার সুন্দর মাঝির ছেলে চাঁদকে একবার দেখে নেবে একহাত।

ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ে—মেয়েরা মহুয়া কুড়োতে ব্যস্ত। সোয়ীকে বলে ওঠে ফুকন—

টুঁটির ত্যাজ দেখ কেনে, যেনে উকে একবার খেয়ে ফেলালেক!

চল্‌রে! দলবল নিয়ে চলে যায় ওরা। সোয়ী হাসে, মাঝে মাঝে একনজর চাইবার চেষ্টা করে—বলিষ্ঠ-চেহারা চাঁদমাঝি ভালুকটাকে শিক্‌লি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে শালুক-চাপড়ার পাহাড়ির দিকে, সেও মাঝে মাঝে চাইছে ফিরে। অজ্ঞাতেই তার মুখে ফুটে ওঠে এক ঝিলিক হাসির আভা।

···আরুলাম্বানের পোষাক আজ একটু ছিমছাম ভদ্রগোছের হয়ে উঠেছে। ধোপদুরস্ত একটা প্যাণ্ট, কোটটাও ছেঁড়া নয়—একটা রং করা বিবর্ণ টাই বেঁধে ফাদার ক্রমফিল্ডের সঙ্গে চলেছে বরাকর সহরের দিকে। উঁচু নীচু চড়াই ভেঙে গরুর গাড়িখানা চলেছে—নীরবে চেয়ে রয়েছে বরাকরের ওপারের বনসমাকীর্ণ পাহাড়গুলোর দিকে। পলাশের রং মিলিয়ে গেছে, ঝরাপাতার মর্মরধ্বনি সারা বনে আজ হাহাকার তোলে। ক্রমফিল্ড সাহেব আজ চলে যাচ্ছেন এদেশ থেকে, আসছেন নতুন ফাদার, হেডউড সাহেব। কে আসছে তার খবর রাখারও প্রয়োজন বোধ করে না আরুলাম্বান! আজ সে যেন সত্যই পিতৃহীন হতে চলেছে। ছেলেবেলা থেকে ওই বিদেশী সাহেবকেই সে জেনেছে সবচেয়ে আপনার জন বলে! সে-ই আশ্রয় দিয়েছিল তাকে, পড়াশুনো করিয়েছে, চিনিয়েছে বৃহত্তর জগতকে, কত অজানা রাজ্যের সন্ধান দিয়েছে তাকে, মানুষকে জানতে শিখিয়েছে। আজ সেই ক্রমফিল্ড সাহেব তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এ জীবনে আর দেখা হবে না।

আরুলাম্বান my boy!

আরুলাম্বান তাঁর দিকে মুখ তুলে চায়।

Try to be a man !

রামনগর ছাড়িয়ে গাড়িখানা এগিয়ে চলে বরাকরের দিকে।

...আরুলাম্বান চেয়ে থাকে... কয়লাকুঠির মালকাটারা মাটির অতল থেকে উঠে আসছে...টিবিং ওয়াগনগুলো ঠেলে নিয়ে। কয়লার কালি আর তাদের ঘাম যেন কোন বন্দী পশুর কল্পনা নিয়ে আসে তার মনে। হঠাৎ একটা সাঁওতাল মালকাটার আর্তনাদে চমকে ওঠে !

লোডিং বাবু মালগাড়ির ওপর থেকে লাথি মেরে একটা কুলি মেয়েকে ফেলে দিয়েছেন, চীৎকার করছে মেয়েটা। মালকাটা মাঝিরা এগিয়ে আসে—লোডিং বাবু সামনের মাঝিটার গালে বসিয়ে দেন এক চড়—হারামজাদা কোথাকার, নিজের কাজ ছেড়ে এসেছিস কামাই করতে, মজুরি কি কম নিবি শালা শূয়োরের বাচ্ছা !

মাঝিগুলো সরে যায়। মেয়েটা পাথরের ওপর পড়ে বেশ চোট খেয়েছে, নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওর তাজা রক্ত, কয়লার গুঁড়োতে মিশে কালচে হয়ে গেছে জায়গাটা। অপরাধটা তার, কাজের সময় বাচ্চা ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছিল। মায়ের অবস্থা দেখে বাচ্ছাটাও যেন কাঁদতে ভুলে গেছে—হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের দিকে এগিয়ে চলেছে সে।

...নেমে যায় আরুলাম্বান, দৃশ্যটা দেখে থাকতে পারে না। লোডিং বাবু একজন সাহেবী পোষাক পরা লোককে আসতে দেখে থামল,—আরুলাম্বান এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে তুলে মেয়েটার দিকে এগিয়ে যায়,—একে খাইয়ে তবে আবার কাজ করবে ও।

লোডিং বাবু কোন কথা বলে না—বিস্মিতই হয়ে যায়।

...গুম হয়ে ফিরে এসে গাড়িতে বসে আরুলাম্বান, ব্রুমফিল্ড চেয়ে থাকেন তার দিকে। তার বংশপরিচয় কোনদিনই বিস্মৃত হয়নি আরুলাম্বান, সেও ওদের দলে। ওর মাও হয়ত ওকে নিয়ে কোনদিন

কাজ করতে করতে অমনি লাথি খেয়েছিল। চিরকালই কি লাথি খেয়ে যাবে ওরা বিদেশী মালিকদের কর্মচারীদের কাছে? ভুলতে পারবে না নিজের জীবনের ব্যর্থতাকে? কোন্ বিদেশী নরপশুর কামনার আগুনে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল তার মা, আর সেই পশুত্বের বোঝা বয়ে যাবে আরুলাম্থান নিজে সারা জীবন ধরে! কেন তার জীবন বিষিয়ে দিল তারা! ওদের সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না!

…কিন্তু মানুষও আছে তাদের মধ্যে! ক্রমফিল্ডকে সে ত ঘৃণা করে না! তবে কেন এই জ্বালা…কেন এই সমাজ-বিতাড়িত জীবন তার…?

কুলটির কারখানায় ভোঁ বাজছে। লৌহদানবের ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি তার সমস্ত চিন্তাজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। বরাকর পোঁছে গেছে তারা। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ক্রমফিল্ড চলে যাবেন এখানকার সীমানা ছাড়িয়ে…আরুলাম্থানের চোখে তার অজ্ঞাতেই আসে বিদায়ের অশ্রুধারা! সাহেবের নজর এড়ায় না।

মিঃ হেডউড আধুনিক যুগের মিশনারি সাহেব, রীতিমত ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং রাজনীতির আওতায় মিশনারি কলেজে মানুষ হয়ে এসেছেন এদেশে—দয়া করে যিশুর করুণাধারা প্রচার করতে এবং আরও কিছু করতে।

হাঁসপাহাড়ি মিশনারি হোমে এসে অবধি তিনি ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছেন আশপাশের সমস্ত কলিয়ারি ম্যানেজার সাহেবদের সঙ্গে পরিচিত হতে। মাটির অতলের খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য লুটেরার দল সাত সাগর পার হয়ে এসে জমিয়েছে তাদের আস্তানা। শতশত

ফুট নীচে থেকে লুঠ করে আনছে এদেশের সম্পদ, মাঝি ওঁরাও সাঁওতালরা ওদের দাপটে কেঁচো হয়ে তুলে এনে ওদেরই হাতে সঁপে দিচ্ছে তাদের মাটির তলায় লুকোনো ঐশ্বর্য।

হেডউড সাহেব আরুলাম্বানকে নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে যাতায়াত করছেন প্রতিটি কলিয়ারিতে। আরুলাম্বান দেখে···সারা মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে অনুভব করে ওদের শোষণের রীতিনীতি। ওর রক্তে জ্বালা ধরে···ব্যর্থ করে দিল যারা ওর সারা জীবন, তাদের কোনদিনই ক্ষমা করবেনা ও!

চড়াইএর ওপর উঁচু টিলার গায়ে সাজান কয়েকটা বাংলো, সামনে কঠিন লালমাটির বুকে ফুটে রয়েছে তাজা গোলাপ—সিজন ফ্লাওয়ারের দল, কয়েকটা ঝাউয়ের চারা বাঁশগড়া ইউক্যালিপটাস গাছের বুকে স্পর্শ বোলায় রাতের শিশির-ভেজা হিমেল বাতাস। সামনেই কলিয়ারির পিট-হেডের আলোটা দেখা দেয়। হলটা মুখর যায় উঠেছে বিদেশী নারী-পুরুষের জটলায়। পিয়োনোয় টুং টাং ছন্দ···রেডিওতে বাজছে সাগর-পারের এক হালকা সুরের রেশ···। গোলাপ-ক্রিসান্থিমামএর মিষ্টি গন্ধ আর গানের সুর নিলে জায়গাটাকে পরিণত করেছে বিজাতীয় এক পরি-বেশে···, ওদের হাসির ঝিলিক···যৌবনমদির লাস্য···মনকে উন্মাদ করে তোলে। বাঁশগড়া কলিয়ারির ম্যানেজার মিঃ কন্‌র‍্যাডএর বাংলোতে পার্টি চলেছে, দূর দূরান্তর থেকে এসেছে অনেক সাহেব মেম···হেডউডও বাদ যায়নি। ককটেল পার্টির কোলাহলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে রাতের আঁধারে একটি প্রাণী···তারার আলোয় তার চোখে দেখা যায় একটা আভা···। আরুলাম্বানের এসব ভালো লাগে না, ধীরে ধীরে সে নেমে যায় নীচের দিকে খোয়া-ঢাকা পথটা বেয়ে।

······এ রাজ্যের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। বনতুলসীর বিশ্রী গন্ধ

ভরা কয়লার কালো গুঁড়োয় ভর্তি পথ···শুঁটকি মাছ আর হাঁড়িয়ার গন্ধ মাতিয়ে রেখেছে এর আকাশ, মাদলের বেতালা শব্দ আর মদোন্মত্ত মালকাটার চীৎকারের অন্তরালে একটা ব্যর্থতার সুর তার সারা মনকে নাড়া দেয়। কুলি ধাওড়ার মধ্য দিয়ে সে চলেছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কি যেন একটা কান্নার সুর! কেরাসিনের লালচে আলোয় ধীরে ধীরে আরুলান্থান ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

···একটা চারপাইএর ওপর পড়ে রয়েছে লোকটা···দেখে চমকে ওঠে আরুলান্থান। ঘরে ঢুকতেই নাকে আসে একটা বিশ্রী গন্ধ, সারা ঘরময় ছড়ান রয়েছে ময়লা নোংরা কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড়। বোধ-হয় কলেরাই হবে। অসাড় হয়ে আসছে লোকটা। মেয়েটা তাকে দেখে আছড়ে পড়ে তার পায়ে···বোধ হয় ওর স্ত্রীই হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ওপাশে জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে, ঘুমুচ্ছে বোধহয়। মায়ের কান্নার শব্দে তারা উঠে পড়ে যোগ দেয় মায়ের সঙ্গে। মুমূর্ষু লোকটা চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে···ক্ষীণ কণ্ঠে চীৎকার করে—জল—জল! মাটির ভাঁড় থেকে মেয়েটা তার শুকনো জিবের ওপর খানিকটা জল ঢেলে দেয়।

আরুলান্থানের চোখে ভেসে ওঠে ওদের কোলাহলমুখর ককটেল পার্টির জটলা। কলিয়ারীর ডাক্তারকে দেখেছিল সেখানে। একবার নিয়ে আসতে পারলে হয়ত শেষ চেষ্টা করা যেত।

বার হয়ে আসে আরুলান্থান—পিছু পিছু মালকাটাদের মেয়েটাও আসে, হাতে পায়ে ধরে যদি নিয়ে আসতে পারে একবার সাহেবকে।

বাঁচবেক উ?

দেখা যাক।

উর কিছু হলে না খেয়ে মরতে হবেক যি! মেয়েটার কথায় কান্নার সুর।

নীরবে এগিয়ে আসে আরুলাম্বান, কোন কথা কয় না।

···মেয়েটার কান্নার শব্দে বার হয়ে আসে স্বয়ং বাঁশগড়া কলিয়ারির ম্যানেজার সাহেব আর দুচার জন অতিথি। ডাক্তার সাহেবের পা দুটো ধরে মাথা ঠুকে চলেছে মেয়েটা—

একটিবার চল তু, উ মরে গেলে ছেলেগুলাকে লিয়ে ঠোর শুকিয়ে মরব! সাহেব···তুর পায়ে পড়ি সাহেব!

অদূরে দাঁড়িয়ে আরুলাম্বান দেখছে এক মনে, মানুষের অন্তর আর পাথর—কোন্‌টা বেশী শক্ত। ম্যানেজার সাহেবকে আসতে দেখে মেয়েটা সরে দাঁড়াল।

What's up ?

Cholera case !

Cholera case ! সর্পাহতের মত চমকে ওঠে ম্যানেজার। বেয়ারা —বেয়ারা! হাঁকডাকে ছুটে আসে একজন বেয়ারা—ম্যানেজার সাহেব চীৎকার করে বলছেন—

নিকাল দেও—নিকাল দেও উস্‌কো। আউর ইস বারান্দাকো ফিনাইল সে সাফা কর্‌নে বোলো···! জল্‌দি করো ম্যান!

···কুকুর তাড়ানোর মত মালকাটা মেয়েটাকে বাংলোর বাইরে করে দিয়ে আসে বেয়ারার দল। মেথরেরা ঝাঁটা বালতি ফিনাইলের টিন এনে হাজির করেছে ততক্ষণ। ওদের অসাক্ষাতে আরুলাম্বান ধাওড়ার দিকে পা বাড়ায়।

···মেয়েটার বুকফাটা কান্নার শব্দে চমকে উঠে ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারে···সব শেষ হয়ে গেছে বেচারার। ছেলেদুটোও কাঁদছে মায়ের কান্না দেখে।···পকেটে যা কিছু ছিল বার করে মেয়েটির অসাক্ষাতে ঘরের মধ্যে নামিয়ে রেখে বাইরে পা বাড়ায় আরুলাম্বান।

বাংলোয় নাচের বাজনা বাজছে পুরোদমে, ম্যানেজার কনর‍্যাড সাহেব একটি মেয়েকে নিয়ে নাচছে···টলছে তার পা।

ওপাশে দেখা যায় হেডউড বকের'মত লম্বা গলা বাড়িয়ে পরম আগ্রহভরে নরনারীদের সম্মিলিত নাচের কুৎসিত ভঙ্গীগুলোর তারিফ করছে। একদণ্ড থাকতে ইচ্ছা করে না এই পরিবেশে, রাতের অন্ধকারেই সে ঘোড়াটাকে খুলে নিয়ে বার হয়ে আসে।

কুলি-ধাওড়ার বুক থেকে তখনও ভেসে আসছে সেই হতভাগীর করুণ আর্তনাদের শব্দ। রাতের তারাগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আরুলাহ্বানের মনের জগতেও আঁকা হয়ে রইল ওদের পাশবিকতার আর একটি অধ্যায়। কে জানে এই মহাকাব্যের কবে হবে শেষ সর্গ রচনা।

ডুংরীর আশেপাশে ক্ষেতে পেঁয়াজের কলি দেখা দিয়েছে মাথায় ঝুমকোর মত শাদা ফুলের স্তবক নিয়ে। আলের আশে পাশে ফুটেছে কুসুমের লাল আভা, বাতাসে দোল খায়। কাঁইজোড়ের জলে বাঁধ দিয়ে ফুকন আর বুধন সিনি ধরেছে, বলিষ্ঠ বাহুর টানে তালে তালে জল উঠছে, নালা বয়ে চলেছে জলস্রোত। আলু বেগুনের ফালি ফালি জমি, ভুরভুরে পাহাড়ি লালচে মাটি জলের রসে ভিজে উঠছে। আলুর সবুজ পাতাগুলো যেন আকণ্ঠ জল পান করে সতেজ হয়ে ওঠে। পলাশ গাছের আড়ালে রোদের আভায় চিকচিক করে ওঠে একটা চলিষ্ণু বিন্দু, ক্রমশঃ এগিয়ে আসে সেটা। সোয়ী দাকা নিয়ে আসছে। বুধন বলে ওঠে ফুকনকে—

তুকে হিংসে হয় মাইরি!

কেনে?

হ দেখ্—আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় বুধন, ফুকন হাসে মাত্র। সোয়ী আসছে।

কাঁইজোড়ের ছায়াঘন তীরভূমি যেন শ্যামল হয়ে উঠেছে। রোদের তীব্র আভা আর পিঠে ফুঁড়ে বসে না। সারা নিস্তব্ধ রজনীর বুকে জাগে গানের সুর।

…সারাদিনের মধ্যে এই সময়টুকু তাকে ভুলিয়ে দেয় সমস্ত ক্লান্তি শ্রান্তি। কালো জলের ধারে কাঁচা শালপাতায় নামিয়ে দেয় সোয়ী একরাশ পান্তাভাত…খানিকটা নূন আর আধপোড়া সজারুর মাংস।

তুর?

ওতেই লুব। পরম তৃপ্তিভরে খেয়ে চলে তারা। জোড়ের জলে জামবাটিটা ধুতে গিয়েছে সোয়ী, ফুকন রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারে না, এক আঁচলা জল ছুঁড়ে দিতেই সোয়ীও তার গায়ে এক জামবাটি জল দিয়ে দেয়। সর্বাঙ্গ ভিজে যায় ফুকনের। সেও হড়বড় করে জলে নেমে পড়ে। দুজনের মাতামাতিতে তোলপাড় হয়ে ওঠে কাঁইজোড়ের জল, পৌষের শীতেও ওরা থামে না। হাসির শব্দে আর কোলাহলে নীরব পাহাড়তলী ভরে ওঠে। জলে ভিজে হাসছে আর হাঁফাচ্ছে দুজনে। বুধনকে আসতে দেখে সামলে নেয় সোয়ী—বাপ্‌রে, ডুবন জল হইল ইখানে; ভাগ্যিস তুই ছিলি লইলে ডুবেই মরতম কিন্তু!

বুধন সিনির দড়িগুলো জুত করতে করতে বলে,—আয়রে ফুকন। এক জোত ধরলেই সব জল শুকিয়ে যাবেক।

আড়চোখে ফুকনের দিকে চেয়ে সোয়ী আঁচলের আধখানা বাতাসে মেলে দিয়ে এগিয়ে চলে ডুংরীর দিকে। ফুকনের কাজে মন আসে না। কোন রকমে সিনির দড়িতে আবার হাত লাগায়।

রাত্রি কাটে কদিন ওদের ডুংরীর বাইরে কাঁইজোড়ের ধারে। আলুর দানা ধরেছে, রীতিমত বড় হতে শুরু হয়েছে এবং সে খবর কি করে পৌছে গেছে বনশূয়োরদের আস্তানায়। রাতের অন্ধকারে ধাড়ি বুড়ো

দাঁতাল শূয়োরগুলো ছা-বাচ্ছা সমেত দল বেঁধে এসে নামে ক্ষেতে, একদিক থেকে চবে মাঠ করে দিয়ে যায়; উলটে দেয় কচি চারাগুলোকে। বছরকার ফসল বাঁচাবার জন্য মাঠের চারিপাশে কুঁড়ে করে আগুন জ্বালিয়ে সারা রাত পাহারা দেয় তারা। ফুকনের চোখে ঘুম আসে না। সকলের অগোচরে কত জ্যোছনা রাত্রির মধু-স্বপ্ন রচনা করেছে তারা দুজনে—সে আর সোয়ী। বলে সোয়ী—

কেউ যদি তুকে দেখে ফেলায়?

ফেলাক গে!

হাসে সোয়ী—বটে আর কি? রাঙা সর্দার তাহলে আর আসতে দিবেক?

দেবে না সত্যি, তা জানে ফুকন; তবু এই মেশবার দুর্নিবার লোভ সামলাতে পারে না। সোয়ী রাঙা সর্দারের মেয়ে, সোয়ী ডুংরীর সেরা মেয়ে, তারই একান্ত আপনার!

মর্দানি দেখাবার দিন এসে গেল। শীতের শেষ। আদিম সাঁওতাল ওঁরাও জাতের জীবিকা বলতে ছিল পশুশিকার। শীতের শেষাশেষি··· মাঘের প্রথম দিন তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন।

সারা পাহাড়-ডুংরীর মাঝি ওঁরাওরা সেদিন একজোট হয়ে বন ঘেরাও করে, একদল ক্যানাস্তারা টিকারা নাগরা পিটিয়ে বন ঝেড়ে নিয়ে আসে সমস্ত জন্তু জানোয়ার তাড়িয়ে একদিকে করে। বনশূয়োর, ভালুক, চিতে বাঘ, মাঝে মাঝে ডোরাকাটাও বার হয়, দলবদ্ধ সাঁওতালরা বর্শা তীর কাঁড় নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে,—যার হাত থেকে শিকার চলে যাবে, আগামী বৎসর তার কাছে অর্থহীন, অমঙ্গলের বৎসর!

হাঁসপাহাড়ি, বরাকর, মাইথন সব অঞ্চলের সাঁওতাল ওঁরাওরা পাহাড়ি

ঘেরাও করে ভোর থেকেই বন ঝাড়তে শুরু করেছে। প্রায় তিন-চার শ সাঁওতাল! টিকারার শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে বনে বনান্তরে। মাঝে মাঝে সম্মিলিত কণ্ঠে চীৎকার···হো···হো···হো···

শালুকচাপড়ার সুন্দরমাঝিও এসেছে দলে। ওদিকে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁদ। দেখবার মত চেহারা! দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, গলায় একটা হিংলাজের মালা, বাবরি করা চুলে লাল একটা ফেট্টি জড়ানো, নিটোল হাতে দুটো রুপোর মোটা বালা। তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সামনের দিকে, গাছের পাতার একটি স্পন্দনও তার নজর এড়ায় না। ফুকন চেয়ে থাকে ওর দিকে,—আজ দেখা যাবে কে বেশী মরদ! সামাল—সামাল যোয়ান···হো ··হো···হোই!

সকলেই তৈরী হয়ে নেয়। এগিয়ে আসছে শব্দটা, সারা বনে যেন ঝড় বয়ে চলেছে! খরগোস কতকগুলো লাফ দিয়ে বার হয়ে গেল। বাচ্চা ছেলেগুলো তীর কাঁড় চালাতে শুরু করল, দু একটা খরগোস লুটিয়ে পড়ল। বড়রা তৈরি থাকে বড় জানোয়ারের অপেক্ষায়।

দিনের রোদ ছেয়ে যায় পাহাড়ের বুকে। ওদের কোলাহল—জানোয়ারের আর্তনাদ আর টিকারার গুরু গুরু শব্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে পাহাড়ের গায়ে। নীরবে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাঝি ওঁরাওএর দল। ঝড়ের মত গাছপালা নাড়ার শব্দ।

ওপাশ দিয়ে একটা ভালুক নেমে আসছে, সাদা দাঁতগুলো মাঝে মাঝে দেখা যায়—একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত বেগে নেমে আসছে সেটা। সাড়া পড়ে যায়।

—সামালে জোয়ান, পয়লা শিকের! বীরসা মুণ্ডা কি জয়!

···উদ্‌গ্রীব জনতা মারমুখো হয়ে রয়েছে। নেমে আসছে ওদিক থেকে একটা বড় দাঁতাল শূয়োর।

বোট্‌কা গন্ধে ভরে যায় জায়গাটা। ঝিঙেফুলি একটা চিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিক চেয়ে ল্যাজ নাড়ছে।

হো···হোই···!

পিছনের লোকগুলোর চীৎকারে বাঘটা একবার চাপা গর্জন করে ফিরে চায়। কর্কশ জিবটা লকলক করে বার হয়ে আসে ধারাল দাঁতের ফাঁক থেকে, পাথরের উপর টপ টপ করে ঝরে পড়ে খানিকটা লালা, সামনের পা দুটো ভেঙে নিয়ে একটু গুঁড়ি হয়ে বসে পড়ে সে··

·সামনের গাছপাতাগুলোর মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন! চাপা গর্জন আর মাঝি ওঁরাওদের কোলাহলে ভরে ওঠে বনটা! বাঘটা সিধে লাফ জমিয়েছে সুন্দরমাঝির দিকে!

পাকা শিকারী তারা বাপবেটা দুজনেই; সুন্দর আর চাঁদ আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল। বাঘটা মাটিতে তাদের ওপর পড়বার আগেই দুজনে দুপাশে সরে যায়, আসমানের ওপরই তাদের বল্লম দুটোর ফলা সবটা গেঁথে যায়, বাঘটাকে মাটিতে ফেলেই দুজন দুদিকে চেপে ধরে! মরণ-কামড় কামড়ায় বাঘটা সামনের একটা শাল ঝোপের গায়ে। বলিষ্ঠ হাতের পেশীগুলো সুন্দরের চড় চড় করে ওঠে। চাঁদ তার দেহের সমস্ত ওজন বল্লমটার ওপর দিয়ে বাঘটাকে গেঁথে ধরেছে, বাঘটাও ওঠবার জন্য চেষ্টা করছে প্রাণপণে।···ক্রমশঃ জোর কমে আসে, রক্তে ভিজে যায় কঠিন মাটির বুক। ছটফট করে বাঘটা, নীচে পড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে! চারদিকে শত শত ওঁরাও মাঝির জনতা। বাপবেটা দুজনে ঘায়েল করেছে মস্ত বাঘটাকে। সেদিনের সে-ই সবচেয়ে বড় শিকার!

ডুংরীতে যখন ফিরে এলো তারা, দুপুরের রোদ হলদে হয়ে পাহাড়ের বুকে ঢলে পড়েছে। ওদের টিকারার শব্দে ভরে ওঠে চারিদিক। একটা ছোট গাড়িতে করে তুলে এনেছে বাঘকে, সুন্দর আর চাঁদের গলায়

কুর্চি ফুলের মালা। মাদলের সঙ্গে নাচতে নাচতে আসছে তারা, সারা ডুংরীর মেয়ে-মরদ ঘিরে ধরে তাদের।

কয়েকটা বনশূয়োর, একটা মাঝারি ভালুক, অনেকগুলো খরগোস-শজারু, কয়েকটা ময়ূর আজকের শিকার। সেদিকে কারুর নজর নাই। বিজয়ী বীর দুজন আর ওই বিশাল বাঘটার দিকেই সবার চোখ।

রাঙাসর্দারের সামনে নামান হয়েছে সেটাকে। চারপাই এগিয়ে দেয় রাঙা সুন্দরমাঝি আর চাঁদকে। কলাই-করা গেলাসে আসে হাঁড়িয়া আর ঠোঙায় চালভাজা। বাইরে সমবেত কণ্ঠে নাচগান চলেছে।

সোয়ী মুগ্ধ বিস্ময়ে বাঘের দিকে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে—আরে বাপরে—ইয়া কুঁদো বাঘটো বটে!

হাসে চাঁদ মাঝি। সোয়ীর চোখেও বিমুগ্ধ দৃষ্টি! সে চেয়ে থাকে চাঁদ মাঝির বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহের দিকে। কোন্ নিপুণ শিল্পীর হাতের তৈরি পাথরে কোঁদা একটা মূর্তি! গলায় একরাশ বনফুল—মাথায় ফেট্টির সঙ্গে পালক জড়ানো, গলায় হিংলাজের মালা—সব কিছু মিলে সোয়ীর মনের পরতে কি যেন একটা আলোড়ন আসে! চোখ নামায় সোয়ী, আবার সকলের অগোচরে তার দিকে চাইবার চেষ্টা করে। দেখে যেন আশ মেটেনা!

...একজনের নজর এড়ায় না এটা, দূর হতে ফুকন চেয়ে থাকে সোয়ীর দিকে। আজকের শিকারে তার কোন নাম নাই; কেউ তার খোঁজও করেনা, চারপাই এগিয়ে দিয়েও আদর জানায় না। সবচেয়ে বেশী বাজে সোয়ীর এই ব্যবহার! তার দিকে একবার ও চাইল না; চাঁদ মাঝিই যেন আজ তার কাছে সবচেয়ে সুন্দর! ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে ফুকন, ভিড়ের বাইরে ডুংরীর ভিতরদিকে চলে যায় একা।

সংবাদটা ফুকনকে দিল রুকনই। সেদিন আর মাঠে কাজ করা

হল না। ঝুড়ি কোদাল নামিয়ে পলাশ গাছের নিচে বসে কি যেন আকাশ পাতাল ভাবে ফুকন। এমনি যে একটা ব্যাপার ঘটবে তা জানত সে; কিন্তু এত শীঘ্রই যে ঘনিয়ে আসবে এই সর্বনাশ তা সে কল্পনাও করেনি।

সকালের সোনালি আলো কাঁইজোড়ের কালো জলে চিকমিক করে, ধূলো উড়িয়ে ফিরে যাচ্ছে দু-একটা কাঠ বোঝাই গাড়ি। শান্ত নিথর প্রান্তর যেন শূন্য, ফাঁকা হয়ে আসে তার চোখের সামনে। এই বিশাল পাহাড়-সীমাঘেরা রাজ্য ফুকনের কাছে অর্থহীন বলে বোধ হয়। রুকন বলে চলেছে—

'আজ গেলে যে উরো লিজে দেখে এলাম! সবাই বুলছে কথাবাত্তা একেবারে নাকি পাকা হয়ে যাবেক ইবার! ই কাড়ানেই বিয়েটোও চুকে যাবেক!

এঁ্যা! ফুকন যেন শুনতেই পায় নি ওর শেষের দিকের কথাগুলো। রুকন চেয়ে থাকে তার দিকে, আলুর ভেলিতে সন্তর্পণে কোদাল চালায় সে, আলু বেশী যাতে না কাটে। আপন মনেই বলে চলেছে রুকন—মেয়ে উরো সাপের জাত! বুঝলি, সাপের জাত! সোয়ীটোও কি কুম বজ্জাত! উয়োরও নাকি মত হইছে ছোঁড়াটোকে বিয়ে করতে!

...ফুকন আপন মনে কাঁইজোড়ের জলে টুপ্‌টাপ্‌ করে পাথর ফেলে চলেছে। শান্ত নিথর জলের বুকে জাগে আলোড়ন, ওরই মনের অবস্থার মত।

আয়রে, লাগ,—টুকচেন, আজই শ্যাষ করে ফেলাতে হবেক, লইলে বনবরাগুলো আবার তেড়ে দিয়ে যাবেক বিবাক।

হুঁ, ফুকন অন্যমনস্ক ভাবে সাড়া দেয়। তার মনের অবস্থা আর কাজ করবার মত নয়। সোয়ী—সোয়ীর বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, এইবার সে পর হয়ে যাবে। যদি একেবারে অনেকদূরে চলে যেতো

তাহলে হত ভালো, তা নয়, বিয়ে হবে তার ওই শালুকচাপড়ার সুন্দর মাঝির ছেলে চাঁদমাঝির সঙ্গে। তাদেরই নামোপাহাড়িতে থাকবে, আসতে যেতে দেখা হবে ; যে সোয়ী ছিল তারই সবচেয়ে আপন—সেই সোয়ী হয়ে যাবে পর, কোন সম্বন্ধই আর থাকবে না ! এ আঘাত সহ্য করা তার পক্ষে কঠিন। চাঁদ মাঝি তার চোখের সামনে থেকে সোয়ীকে নিয়ে যাবে—এ যে তার কত বড় পরাজয়, তা কল্পনা করতে পারেনা সে।

…রাঙা মাঝি আর একজন মাতব্বর হুটোমাঝিকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছে সুন্দরমাঝির ঘরে ; চাঁদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা করতেই। এ অঞ্চলের মধ্যে সুন্দর বেশ থাকা লোক। আর পাত্র হিসেবে কোন দিক দিয়েই চাঁদ অযোগ্য নয়।

সামনের গোয়ালে কয়েকটা বেশ কালো মিশমিশে ডুধেল মোষ বাঁধা রয়েছে। চাষের জন্য একজোড়া কাড়া বাঁধা, সকালের রোদে তারা জাবর কাটছে বসে বসে। হুটো মাঝির গায়ের লাল দোলাইখানা দেখে মাঝে মাঝে লাল চোখ মেলে চায় ওরা, শিং বাঁকিয়ে, নাক দিয়ে দীর্ঘ শব্দ করে—ফোঁওস্ ! ফোঁওস্ ! মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে।

বলে ওঠে রাঙা মাঝি—বাহারের কাড়া জোড়াটো হইছে পারা ! প্রশংসার দৃষ্টিতে সুন্দর মাথা নাড়ে—দু-কুড়ি টাকাতে লিয়ে আইছিলাম দুটোকে জামতাড়ার হাটে, দিশি বাচ্চা বটে !

হুটো মাঝি চোখ কপালে তুলে বলে, হুঁ কি মোষ বটে ! মোষ ত লয়—যেন পঞ্চকোট পব্বোত! বারেক্কে খুরের থাবড়াতেই একটা লাঙলের কাজ হবেক !

…অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল সুন্দর ওদের বাড়ির মধ্যে। চাঁদ

নাই, সে গেছে বরাকরের হাটে, বনদারের সঙ্গে কাঠের ইজারা নেবার জন্যে।

সুন্দর গল্প করে চলেছে তার অতীত এবং ভবিষ্যৎএর। এবার মনে করেছে বনের কাঠ কেটে সহরে চালান দেবে, কয়লাকুঠিতে যোগান দেবে শালের রোলা। ভালো দাম পাওয়া যাবে।—বুঝলে রাঙা কর্তা, চাঁদ আমার বেশ মানুষ হয়েছে, কয়লাকুঠিতে সাহেবদের সঙ্গে ও কথা কয়ে আসে! কাঠের ব্যবসাটা লাগাতে পারলে মন্দ লয়। মাদ্‌না বংগার থানে ইবার সিমেণ্ট দিয়ে তুব বিবাক, আর তুটো পাঁঠা মানত।

রাঙা মাঝির বয়স হয়েছে, জানে সে, মাঝির পক্ষে এই সভ্যতার ছোঁয়াচের পরিণাম কী! পয়সা পাবে আর সে হারাবে তার সহজ সরল মন। চুপ করে থাকে রাঙা সর্দার। হুটো মাঝির চোখে মুখে বিস্ময়! —এতবড় ঘরে সোয়ীর বিহা দিবা সর্দার, সোয়ী দেখবা 'আনি' হয়ে যাবেক নির্ঘাৎ।

—হুঁ! কথাটা ঠিক যেন রাঙার মনে ধরে না।

সুন্দর মাঝি এতদিন পর কোথায় যেন ভুল করতে বসেছে। তবু কথাবার্তা কয়ে আসে। সুন্দরেরও নজরে ধরেছে সোয়ীকে; বউ করে আনবার মত মেয়ে বটে!

চাঁদ নিজেই বলেছে তার অমত নাই—সুতরাং যত শীঘ্র কাজটা সেরে ফেলতে পারে ভালোই।

সুন্দর কিছুতেই ছাড়বে না—সী কি হয়! না খেয়ে যেতে তুব নাই!

রাঙা বলে ওঠে—সী আর একদিন হবেক গো, একা লই—সবাই মিলে আসব! খাওয়া আর গেছেক কোথাকে—উ হবেকই!

সুন্দর এগিয়ে দেয় রাঙাসর্দারকে ভালুকচাপড়ার শেষ সীমানা অবধি।

কাঁইজোড়টা পার হয়ে আসছে তারা দুজনে, হঠাৎ কাকে দেখে যেন একটু থতমত খেয়ে যায় রাঙা মাঝি। ফুকন জোড়ের ধারে পলাশ তলায় তখনও বসে রয়েছে, রুক্‌না একাই আলু তুলে জড় করছে।

ফুকনের মনে কথাটা আর অবিশ্বাস্য কিছুই থাকে না—ওরা ভালুকচাপড়া থেকে আসছে সুন্দর মাঝির ঘর হতে। ফুকন অন্যদিন কথা বলে রাঙামাঝির সঙ্গে, আজ হতে ওর সঙ্গে কথা বলতেই ইচ্ছে করে না।

কি করছিস রে ফুক্‌না, আলু হয়েছে কিমন? ডাগর বটে ত? রাঙার ডাকে মুখ তুলে চায় মাত্র, পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নেয় সে, কোন জবাবই দেয় না।

রাঙা মাঝি একটু বিস্মিত হয়ে যায় তার এই ব্যবহারে। ঠিক বুঝতে পারে না কারণটা। নীরবে তারা এগিয়ে চলে ডুংরীর দিকে।

দুপুরের রোদ জমাট হয়ে শয়ন বিছায় প্রান্তরের বুকে, পাহাড়ের নীচে কেঁদ গাছের দীর্ঘ ছায়া ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। ভন্নি দুপুরবেলা। হেডউড সাহেব আসা অবধি হাঁসপাহাড়ির মিশনারি হোমে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে। ফাদার ক্রমফিল্ডের সমস্ত কর্মপদ্ধতি উল্‌টে দিয়ে সে নিজের মতেই সমস্ত কাজ করে চলেছে। আশেপাশে হাটবাজারে প্রতি সপ্তাহে ধর্মপ্রচারের সভা হবে, সাঁওতাল ওঁরাও মুণ্ডা—সমস্ত আদি জাতির ডুংরীতে ডুংরীতে গিয়ে তাদের জানাতে হবে যে একমাত্র তিনিই ভগবানের বাণী নিয়ে এসেছেন, যত বেশী সংখ্যায় পারা যায় তাদের এই পথে আনতে হবে।

আরুলাম্বান সারা মন দিয়ে ঘৃণা করতে শুরু করেছে এই লোকটিকে। বকের মত লম্বা গলা, টিকলো নাকের দুপাশে শকুনির মত চোখ দুটি

নীল আভায় জ্বল জ্বল করছে। মনে মনে কিসের একটা প্যাচ চলে ওর। ফাদার ক্রমফিল্ডকে চিনত না জানত না এই অঞ্চলে এমন কোন ওঁরাও সাঁওতাল ছিল না। হাটে বাজারে বনে 'বাবা সাব' বলে সকলেই তাঁকে সম্মান করত। হাসিমুখে ক্রমফিল্ডও মাথা নেড়ে কুশল জিজ্ঞাসা করতেন—কেমন আছিস টু—এ্যাই বোড়ো মাঝি ?

ওঁরাওরা মেরে আনত শজারু, ক্রমফিল্ড পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে দিতেন ওদের—লে—এ্যাই মাতি লে—লে।

ছাতাপরবে নেমতন্ন করত ওরা সাহেবকে, সাহেব ঘোড়ায় করে ডুংরীতে ডুংরীতে ঘুরে বেড়াতেন ওদের নেমন্তন্ন রক্ষা করে—প্রশংসা করতেন,—**Very good**···টুদের লাচ হামার ভালো লাগলো, এ্যাই, ফিন্ লাচ্।

মাঝে মাঝে ফাদার ক্রমফিল্ডও প্যাণ্ট পরেই নেমে পড়তেন ওদের আসরে। ফিরতে সেদিন অনেক রাত্রি হতো—পকেটে করে নিয়ে বেরোতেন অনেক সিকি আধুলি, সবগুলো না ফুরোনো পর্যন্ত তিনিও ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন পরবতলায়।

সেবারের দৃশ্যটা আজও মনে পড়ে! ডুংরীর ছেলেরা মাছ ধরছে কাঁইজোড়ের জলে, ফাদার অনেকক্ষণ অবধি দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কলরব, জলে হুড়োহুড়ি। মাছগুলো লাফ দিয়ে পালাচ্ছে ওদের জাল থেকে, চীৎকার করে সাহেব—**Goodness** ! ভাগতা হ্যায়, এই মাঝি—**Pooh** ! কুছ কামকা নেই টুম। পাকড়ো—পাকড়ো !

আরুলাম্বানের ডাকে ক্রমফিল্ড ফিরেও চায় না। হঠাৎ চীৎকার করে নিজেই নেমে পড়ে হড়বড় করে এক হাঁটু জলে প্যাণ্ট সমেত। মাঝিগুলো একটু বিস্মিত হয়ে যায়, সাহেবও ক্রমশঃ তাদের দলে মিশে হৈ চৈ শুরু করে! বৈকাল অবধি দাপাদাপি করে বেশ কিছু মাছ ধরে তারা। সন্ধ্যার মুখে সাহেব কাদামাখা প্যাণ্ট সমেত জুতোহুটো ঘোড়ার জিনে

বেঁধে কয়েকটা কাতলার পোনা খেজুরশিকে ঝুলিয়ে গান করতে করতে ফিরে আসে হাঁসপাহাড়ির বাংলোয়।

তারপর বেশ কটা দিন সর্দিতে ভুগে আক্কেল হয়েছিল, এর পর আর কোনদিন ওরকম বেয়াড়া সখ চাপেনি ওঁর মাথায়। ফাদার ব্রুমফিল্ডের কাহিনী ডুংরীর সবাই জানে, উনি ছিলেন তাদেরই একজন! সব ধর্ম, সব ধর্মমতকেই তিনি বিশ্বাস করতেন, মানতেন। একটি মূল সুর—মানুষকে ভালবাসা—এই ছিল তার ধর্ম। হেডউডের ধর্মমত তাঁর কাছে পৌছতে পারবে না কোন দিন।

সফরে বার হয়েছে হেউডড সাহেব নিজে—ঝুমরীতালাওএর হাটে। আরুলাহ্বানও সঙ্গে রয়েছে। কলিয়ারি অঞ্চলের আশপাশের হাটের মধ্যে ঝুমরীতলাওএর নাম আছে। কুলি মালকাটাদের হপ্তার পরদিন হাটবার, এইদিন সব কলিয়ারিও বন্ধ। দল বেঁধে মেয়ে পুরুষ আসে সপ্তাহের হাট করতে। কয়েকখানা ভাটিয়া মাড়োয়ারিদের পাকা ঘর—বাকি সব চালা বাঁধা। কুমড়ো, বেগুন, আলু, শুঁটকিমাছ আসে প্রচুর। ওপাশে বসে কাটা পোষাকের ফেরিওয়ালারা রংবেরংএর টুকরো ছিটের জামা আর শস্তা পাথরের মালা ঘুনসি চুড়ি নিয়ে, মাঝি মেয়ে-পুরুষদের ভিড় ওইখানেই বেশী।

নিটোল পুরুষ্টু মেঝেনদের হাতে অনর্থক জোর করে টিপে ধরে বেলোয়ারি চুড়ি পরাবার বৃথা চেষ্টা করে ফেরিওয়ালা। মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে কমবয়সী ছুঁড়িটা—টুকচেন বড় পারাই দাও কেনে, লাগছে যি হাতে!

দোকানদার মুচকি হেসে আবার অন্য চুড়ি পরাতে থাকে। মেয়েদের মধ্যে একটা হাসির আভা পড়ে যায়। হাসির ঝলকে নিটোল বুকে দোলা লাগে।

—পছন্দ হইচে তুকে উয়ার!

—ধ্যাৎ! মুখ নামায় বাচাল মাঝি মেয়ে।

বরাকরের মহাজন সুরযবাবুর হাট। গম, সামান্য ধান আর আলু বোঝাই গাড়িগুলোকে ঘিরে শিউরতনের ফড়েরা দর কসতে থাকে—

আট টাকার বেশী হবে না, বুঝলি! আট টাকা মণ।

মাঝিরা এবার বাজারে কিছু বেশীই আশা করেছিল। সারা বছরের রোদ জল বৃষ্টির মধ্যে ফলিয়েছে এই ফসল—মাত্র সামান্য টাকায় দিতে চায় না। আঙুল গুণে কয়েকবার চেষ্টা করে বলে ওঠে,—দু গণ্ডা দু টাকার কমে দুব নাই।

হঠ্ হঠ্, ভিড় পাতলা কর্! গর্জে ওঠে শিউরতন। সিঁটকে লোকটা, নাগরা জুতো পায়ে এক সাইজ বড়, মাথায় পাগড়িটা বেশ বসিয়ে নিয়ে অন্য মাঝিকে বলে ওঠে—তামাম হাটে আমার চেয়ে বেশী দর যে দেবে হামি তার সম্বন্ধী আছি। দেখ লেও।

চলে যায় মাঝিরা। ওপাশে কয়েকটা মালকাটা সপ্তাহের বাজার করতে এসেছে—আটা, চাল, ডাল কিনে নিয়ে যাবে। শিউরতনের কিনবার এবং বেচবার বাটখারা আলাদা। নিমেষের মধ্যে বাটখারা বদল হয়ে যায়, কাঁচি বাটখারায় মাল ওজন করে দেয় তাদের।

গর্জন করে ওঠে শিউরতন—এক্কো প্যাইসা কমতি নেহি হোগা—চল্ বে ভুঁসড়িওয়ালা!

ছুঁড়ে ফেলে দেয় পয়সাগুলো—কাকুতিমিনতি করতে থাকে মালকাটাগুলো—ছোট মেয়েটা ব্যাকুল নয়নে দেখে, তাকে লাড্ডু কিনে দেবার মত পয়সাও আর রইলো না বাবার ট্যাকে! পাই পয়সা গুণে নিয়ে ছাড়ে শিউরতন।

দোঠো প্যাইসা, বাচ্ছাকো মিঠাই খিলায়ে গা শেঠজী!

ভেংচি কেটে ওঠে শিউরতন।

বড়ে আয়ে হ্যায় মিঠাই খিলানেওয়ালে—ভিক্ মাঙ্ উধার!

এক কড়ি নেহি ছোড়ে গা! চল্, হঠ্ হঠ্ বে! তাড়িয়েই দিল তাদের।

শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিক চাইতে চাইতে আটা চাল ডালের মোটগুলো মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যায় তারা। মেয়েটা কাঁদছে, খিদে লেগেছে তার। লোকটা সশব্দে বসিয়ে দেয় তার গালে একটা চড়—শ্বাষ করে ডুব হাফ্ হাফ্! চুপ করে থাকে সে মারের ভয়ে।

মালের গাড়ি নিয়ে আলুওয়ালা মাঝিরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। শিউরতনেরই দুটো দোকান এই হাটে। সে দোকানে মাল নিলে না, কোথায় আর যাবে—লে তুই লে, কিন্তুক দু গণ্ডা এক টাকা করে মণ দিবি।

গর্জন করে ওঠে শিউরতন—লে চল্ হিঁয়াসে! নেই লেগা হাম!

চোরের মত কম দরেই মাল দেয় তারা, কেনে শিউরতন। পাল্লার বাটখারা ইতিমধ্যে বদল হয়ে গেল কি করে।

কৃতার্থ হয়ে যায় ওঁরাও মাঝির দল, শিউরতন তাহলে মাল কিনছে তাদের!

···হেডউড সাহেবের চীৎকার হাটের কোলাহলে ডুবে গেছে, গোটা-কতক টবের বাক্স এক করে উঠে দাঁড়িয়ে সাহেব চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে। আশে পাশে কৌতূহলী জনতা, মালকাটা মাঝিদের ভিড়। মেয়েরা ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আঁটসাঁট কাপড়খানা অজ্ঞাতসারেই কখন স্থানচ্যুত হয়ে গেছে খেয়াল নেই। সাহেবের চীৎকারে মাঝে মাঝে হেসে ওঠে তারা।

···ই আকাশ—পানি পাখল জঙ্গল ফরেস্ট কোন্ সৃষ্টি করিলে! তুমাদের সব দুঃখ বিপদ মধ্যে কোন্ সান্ত্বনা দিবে? সব অন্‌ডোকার দূরীভূত হইবে···

কৌতূহলী জনতা একজন সাহেবকে চীৎকার করতে দেখে চেয়ে থাকে তার দিকে। সাহেবদের ওপর এদের সম্পূর্ণ অন্য ভাব—ম্যানেজার সাহেব—ডাক্‌দার সাহেব—কম্পাস সাহেব···এদের স্বগোত্র, অমনি বাংলোয় থাকে—মটর গাড়িতে চড়ে আর কুলি কামিন ঠেঙায়···এই এদের ধারণা ওই সাদা চামড়াকে ঘিরে,—তাই দূরত্ব বজায় রেখেই চেয়ে থাকে। সাহেবের চীৎকারের মাত্রাও বেড়ে যায় লোকসমাগম দেখে।

নিজে নেমে গিয়ে মালকাটা ছেলেমেয়েদের হাতে গুণে দেয় মথি-লিখিত সুসমাচার, আরও ছোট ছোট রং বেরংএর কাগজ। মালকাটারা সেলাম করে আর বিস্মিত দৃষ্টিতে কাগজগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। মেঝেনরা বইগুলোকে পেট-আঁচলে গুঁজে নেয়, কি জানি কি এক অমূল্য সম্পদ!

হাটের কোলাহলের বাইরে এলো যখন তারা বেলা গড়িয়ে গেছে। ঘর্মাক্ত কলেবরে দিগ্বিজয় করে এসেছে হেডউড সাহেব, পিছনে পিছনে বই-প্যামপ্লেটের বাণ্ডিল নিয়ে আধমরা ঘোড়ার পিঠে আসছে আরুলাম্বান। দীর্ঘদিন পর আজ সে প্রচার করতে বার হয়েছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা আলোড়ন চলেছে তার মনে! নীরবে আসছে তারা পাহাড়ি পথ ধরে।

গ্রীষ্মের খর রোদ পাহাড়তলির বুকে এনেছে বৈশাখের রিক্ততা। কপিশ প্রান্তরের বুক লি লি করে কাঁপছে। বাতাসের সঙ্গে বরাকর নদীর বুক থেকে উড়ে আসে তপ্ত বালু-ঝড়, গায়ে লাগলে ফোস্কা পড়ে যায়। কাঁইজোড়ের জলধারা নিঃশেষ হয়ে এসেছে, পাথরের আড়ালে আড়ালে বন্দী জল তির্ তির্ করে বয়ে যায়। এই সময় ডুংরীর

বুকে আসে অভাবের তাড়না। কোন ফসল নাই, জীবিকা একমাত্র কাঠ কেটে সহরের দিকে নিয়ে যাওয়া। কেউ বা বাঁশের ঝুড়ি বানায়, কলিয়ারী ঠিকেদাররা নিয়ে যায়।

খর রোদে হাঁফাচ্ছে রাঙা সর্দার। এখনও কালবৈশাখীর আশীর্বাদ নিয়ে এল না একটুকরো কালো মেঘ, একদিনের বর্ষণেও বুভুক্ষু মাটি তৃপ্ত হল না।

কেঁদ গাছের ছায়ায় বসে রয়েছে ফুকন। আশেপাশে চরছে গরু মোষগুলো। গাছের আড়াল থেকে তাদের গলায় ঝোলানো কাঠের ঘণ্টার ঘট্ ঘট্ শব্দ ভেসে আসে। কোনদিকেই তার নজর নাই, শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে সামনের পাহাড়ের দিকে। দৃষ্টিপথ ওর ব্যাহত হয়ে গেছে ওইখানে। শুনেছে সে সব কথা, সোয়ীর বিয়ে পাকাপাকি হয়ে গেছে চাঁদের সঙ্গে,—কি দেখে তার হাতে দেবে রাঙা তার মেয়েকে, অবস্থা ফুকনের তেমন কিছু নয়। আর পরিচয়? সে ত চোখের কাজল···চোখের জলেই ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যাবে, কোন চিহ্নই থাকবে না।

আজ সব কিছুই ওর কাছে শূন্য মনে হয়, এই পাহাড়ি বন সব কিছুই আজ আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে দম্‌কা বাতাস আসে এক ঝলক আগুনের মত, আবার ক্ষণিকের জন্য শান্ত হয়ে পড়ে প্রান্তরের বুক।

সোয়ীর মনে এসেছে চিন্তার রাশি। জানে সে, আর ফুকনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকবে না, একেবারে সে পর হয়ে যাবে। এই হারানোর হাহাকার তার অন্তরকে রাঙা করে তোলে। সেই শিকারের পর থেকে ফুকন আর তার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেনি,—চাঁদের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হতে বিচ্ছেদটাকে যেন পাকাপাকিই করে নেয়!

কুসুম সেদিন বলেছিল—তুর জন্যে উ বিবাগী হয়ে যাবেক সোয়ী !

মুখ ঝামটা দিয়েছিল সোয়ী—তাতে আমার বয়েই যাবেক কিনা !

হেসেছিল কুসুম। সোয়ীও জানে এ তার মনের কথা নয়। তার জীবনে প্রথম এসেছে ফুকন, সে-ই চিনিয়েছে তাকে ধরণীর আলোছায়ার স্বপ্নজাল-বিছানো মনোজগৎ। বরাকর নদীর গৈরিক জলধারায় জীবনের প্রথম যৌবনস্নাত দেহ সে তুলে ধরেছিল—ফুকন ছিল তার সারা মন জুড়ে।

হঠাৎ ফুকনকে এখানে দেখবে কল্পনা করতে পারেনি। কাঁইজোড়ের বালি থেকে চুয়া খুঁড়ে জল আনতে এসেছে, নির্জন জলের ধারে কেঁদগাছের নিচে এড়ো পাথরের উপর কে একজন বসে! হ্যাঁ ফুকনই···

সারা দেহে মনে সোয়ীর শিহরণ জাগে! নির্জন পরিবেশ তাকে বাঁধনহারা করে তোলে, পা টিপে এগিয়ে যায় সে। কেউ নাই, বিস্তৃত প্রান্তরের বুকে খাঁ খাঁ করছে রোদ, ঝির ঝির শব্দে বয়ে চলেছে জলধারা।

ফুকন চমকে ওঠে—তুই !

সোয়ী একেবারে তার পাশেই বসে পড়ে, গা ঘেঁসে।

হ্যাঁ, চিনতে পারছিস ?

তুকে চেনাই ভার ! ইখানে কেনে আইছিস ?

আমার খুসী আইছি !

ফুকনের মনে জাগে অভিমান-রুদ্ধ ব্যর্থতার প্রকাশ। উঠতে যাবে, হাতটা তার ধরে ফেলে সোয়ী—

শুন্ কথা আছে। বস্—

সোয়ীর স্পর্শে ফুকন যেন বদলে যায়, বসে সে। অবাক হয়ে যায়, সোয়ীর চোখে জল !

কাঁদছিস্ ?

কথা কয়না সোয়ী, কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠে তার দেহ। ফুকনের কোলে মাথা রেখে সে কেঁদে চলেছে—

আমার কুন দোষ বল্ ? তু আর কথাও বলিস না, রা-ও কাড়িস না, তুর পরই হয়ে গেলাম শ্যাষকালে ?

সোয়ীর ব্যাকুল কান্নার অর্থ বোঝে না ফুকন। সোয়ীর সত্যই কোন দোষ নাই, সে কি পারেনা তাকে বিয়ে করতে, এখান থেকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে ?

সোয়ী চল্ আমরা অন্য কুথাও পালাই ; ই ডুংরী ছেড়ে—

কথা কয়না সোয়ী। ডাগর কালো চোখ দুটো মেলে চেয়ে থাকে তার দিকে। নিটোল পুরুষ্টু দেহের উষ্ণ স্পর্শ ফুকনকে কেমন উন্মাদ করে তোলে।

সোয়ী···সোয়ী ! তুকে যেতে দুব নাই, চাঁদের ঘরে তু যেতে লারবি !

কথা কয়না সোয়ী, ব্যাকুল আবেগ-ভরা চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে। কতক্ষণ যে কাটে এইভাবে তা জানে না। সোনার রংএর রোদ শালবনসীমায় স্পর্শ বুলায়, সুঁড়িপথ বেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে দু'একজন ওঁরাও কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে। গরু মোষগুলো ক্রমশঃ বার হয়ে আসছে বনের মধ্য থেকে···জলের ধারে কোঁচবকগুলো উড়ে গেছে···তাম্রাভ পাহাড়ের ছায়া কাঁইজোড়ের জলে কালো হয়ে আসে···টুকরো টুকরো ছেঁড়া মেঘ জাফরানি রঙে ভরিয়ে তুলেছে আকাশের কোল···

সোয়ী কলসীতে জল ভরে ডুংরীর দিকে ফিরে আসছে, ফুকনের মনটা যেন অনেক হালকা হয়ে আসে ! সোয়ীর ব্যথার বোঝা যেন কানাকানি করে কলসীর উপছে পড়া জলের সুরে সুরে। বেশ ছিল

ভুলে, ফুকনের সঙ্গে আজ দেখা হয়ে স্মৃতির পাথার যেন টলমল হয়ে উঠেছে ব্যথার জোয়ারে। না গেলেই ছিল ভালো! কি হবে মিথ্যা স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করে!

রাঙা সর্দারের মাথা সে নীচু করতে পারবে না, সাতাশীর সর্দারের মেয়ে সোয়ী, চোরের মত একটা মামুলি ছেলের সঙ্গে অজানা পথে বার হয়ে যেতে পারবে না সে!

ফুকনকে আজও সে ভালবাসে, কিন্তু তার ভালবাসা কামনামদির নয়, তাকে তার কর্তব্য সম্মানজ্ঞান বিস্মৃত করিয়ে দিতে পারবে না। তার ভবিষ্যৎ যাই হোক···বাবাকে ব্যথা দিতে পারবে না।

···গরু মোষের দল লাল ধূলো উড়িয়ে ডুংরীর দিকে ফিরে আসছে, একটা মোষের পিঠে চেপে আসছে ফুকন। তার বাঁশীর সুরে সুরে আজ গোধূলিবেলা মুখর হয়ে ওঠে।

সুন্দরমাঝি কথাটা শুনে থেকেই ছেলেকে ক্ষমা করতে পারে নি। তাদের স্বত্ব স্বামীত্ব এই বনপাহাড়ের উপর জন্মকাল থেকেই। বনের গাছপালা ফলমূল তাদের জীবন রক্ষা করে এসেছে, তাদের ক্ষুধায় অন্ন জুগিয়েছে, তেষ্টায় জুগিয়েছে জল; ওই বনের থেকেই হয় তাদের জীবিকার সংস্থান। সেই বন পরের হাতে তুলে দেওয়া মানেই জাতের সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ করা।

সেদিন ডুংরীর কয়েকটা ছেলে বনের মধ্যে কেঁদ পাড়তে গেছে। বিশাল বনস্পতির ডালে ডালে লাল টুকটুকে ফলগুলো অজস্র পেকে রয়েছে, তলা বিছিয়ে পড়ে থাকে ওগুলো। ঝুড়ি ভর্তি করে এনে পালুইএর তলায় ফেলে রাখে, গুমসে পেকে ওঠে। বরাকরের রামনগরের হাটে বিক্রী করে পয়সায় চারগণ্ডা দরে। পাড়তে গেছে,

বাধা দেয় সুরযপ্রসাদের কয়েকটা লোক—বনে পয়সা না দিয়ে কেউ ঢুকতে পাবে না। ছেলেগুলো ঘুরপথে পাহাড়ের সুঁদ পার হয়ে কেঁদ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। দুএকজনকে ধরতে পেরে মারধোরও করেছে। কাঁদছে ছেলেগুলো। ডুংরীর সাঁওতাল ক্ষেপে ওঠে—

চলত রে, দেখে আসি উগুলানকে! কাঁড় বাঁশ নিয়ে বার হয়ে যায় দু-চার জন জোয়ান। কিন্তু লোকগুলোও ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

সুন্দরমাঝির বাড়িতেই কথাটা উঠেছে। সুন্দরও বিশ্বাস করতে পারে না যে এমনি করে ওদের জীবিকার সংস্থান বন্ধ করে দেবে সুরযপ্রসাদের লোক।

ইয়ার একটা বিহিত করতেই হবেক, হাটে লয়-ছয় করে জমির ধান—ফসল কিনবেন উ। আবার আমাদেরই বনের থেকে তাড়াই দিবেক আমাদিকে?

যোগান দেয় গুরুমাঝি—চাঁদ—চাঁদই ইয়ার মূল কিন্তুক! উই লিয়ে আইছে উটোকে পয়সার লোভে!

—হুঁ—সি ঠিক, ঠিক কথা বলেছ। বল কেনে গে তুরা—দোষটি কার বটে?

ডুংরীর সকলেই মাথা নাড়ে। সুন্দর মাঝির মাথাটা নীচু হয়ে যায় ছেলের ব্যবহারে। বনদারের হাতে মার খেয়ে ছেলেগুলো দূরে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে—দেখে লিব শালোদিকে। ইবার বনের ধারে দেখলেই কাঁড়াই দুব নির্ঘাৎ!

মজলিসে সুন্দরমাঝি চুপ করে অপমানটা হজম করে আসে। চাঁদ বাড়ি ফিরেছে বনরাজ্য জয় করে। সুরযপ্রসাদবাবুর বনের সমস্ত কাজেরই দেখাশোনা করতে হবে, নিজেও কিছু কিছু বন বিক্রীর ব্যবসা করছে। দু'এক বৎসরে তাকে আর ডুংরীর খুপরি ঘরে থাকতে হবে না।

চোখে বরাকরের পাকি মদের নেশা তখনও কাটে নি! বনে লোক খাটাবার জন্য সুরযবাবুর দেওয়া টাকাগুলো তখনও করকর করছে জামার পকেটে! চোখের সামনে কেমন যেন রঙিন আকাশ। সোয়াঁ! সোয়ীর যৌবনমদির চাহনি, বলিষ্ঠ নিটোল দেহখানা সারা তন্ত্রীতে কি যেন উন্মাদনা আনে!

বাড়িতে পা দিতেই সুন্দরমাঝি এগিয়ে আসে। ছেলের দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চেয়ে থাকে। দেখেই বুঝতে পারে নেশা করে এসেছে। চোখ দুটো করমচার মত লাল! পা তার টলছে।

মদ খেয়ে আইছিস?

—টুকছেন, দিলেক সুরযবাবু!

ইসব কি শুনছি, বিবাক বন তু নাকি বলেছিস বাবুকে কিনে লিতে?

উ লিলেক। বললেক আমাকে, আমার বনের কাজকম্ম তু দেখে দিস্, দু আনা ভাগ দুব, মাসে খোরাকী দুব এককুড়ি টাকা করে। লিয়ে লিলম।

কেউ যদি বলে তুর জাত-ধরম বিচে দে এককুড়ি টাকা দুব, দিবি?

চুপকরে থাকে চাঁদ। এর সঙ্গে জাত ধরম বেচার কি থাকতে পারে বুঝতেই পারে না। তবুও বলে ওঠে—তুমরা ব্যবসা বুঝনা, বিচব টাকা লুব, ব্যস।

ঘৃণায় ছেলের দিকে যেন চাইতে পারে না সুন্দর। এই তার ছেলে! সারা জাতের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থই বড় করে দেখছে, লেখাপড়া শিখিয়েছিল এর জন্য!

বনদার বলেছে, বনের গাছ-পালা, ফল জানোয়ার বিনিপয়সায় মারতে পাবেক নাই, উয়ারা সব খাবেক কি?

তার কি জানি আমি?

বলে ওঠে সুন্দর—তুর বনদার বাপকে বুলিস বন আমাদের, আমাদের যা দরকার তা লিবই! জোর করেই লিব। লিয়ে থুয়ে যদি কিছু থাকে তা উয়ার। আমাদিকে আটক করতে এলে অনথ হয়ে যাবেক, তু যদি সিরো থাকিস তুকেও ছেড়ে দিবেক নাই উরা। সুন্দর জোরে চুটিতে টান দিতে থাকে। বার হয়ে গেল চাঁদ।

দামী মদের নেশাটাই চটকে গেল বাপের সঙ্গে কথায়। পকেটে কয়েকটা টাকা ঝনঝন করছে। এগিয়ে চলে তিরোল গাছটার নিচে দিয়ে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে ঃ দু একটা মহুয়া তেলের টেমি জ্বেলে কেউ বা গরু দুইছে, কারুর ঝুপড়ি থেকে মত্তপ কণ্ঠের চীৎকার ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে আবার নেশা এবং উন্মাদনার আভাস ফিরে আসে তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

লালী মেঝেন দাওয়াতে পড়ে রয়েছে, মুখের কাছে ভনভন করছে দু'একটা মাছি। একটা অম্ল-ঝাঁঝাল গন্ধ ভরে তুলেছে ঠাঁইটাকে। আগড়টা ঠেলে ভিতরে ঢুকে এগিয়ে যায় চাঁদ। এ্যাই! ঠেলা দিয়েও লালীকে তুলতে পারে না।

বয়স প্রায় তিরিশের কোঠা ছাপিয়ে গেছে। বহু সংগ্রাম করে লালী এখনও তার বিগত যৌবনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে, তবু মাঝে মাঝে নেশায় বেটোর হয়ে যায়। চাঁদের কণ্ঠস্বরে কোনরকমে উঠে বসে। কাপড়চোপড় ঠিক নাই, চোখের চাহনি কেমন বিভ্রান্ত। চাঁদের হাত দুটো তাকে টেনে তোলে।

লিয়ে আয় লেশা কি আছে—

ঘরের কোনে রইছে আন কেনে তু!

চাঁদই নিয়ে আসে কালো একটা ভাঁড়, খানিকটা খেয়ে দম নিয়ে লালীকে কাছে টেনে নেয়।

কি লিয়ে আইছি দেখ্।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা যায় রূপোর নারকেল ফুল। লালীর চোখদুটো চকচক করে ওঠে—

পরাইয়ে দাও ভাই!

লালী ভাঙা গলায় বলে চলেছে—বিহা হলে কিন্তুক ভুলে যাবা আমাকে! শুনছি সোয়ী নাকি ভারি সোন্দর আর ডাগরটি বটে!

চাঁদের চোখে মদের নেশা। ধ্যাৎ, তুর কাছে সে! চাঁদে আর মিনি-বাদরের সঙ্গে তোলনা!

আরুলাস্থানের সঙ্গে হেডউড সাহেবের সেদিন একটু চটাচটিই হয়ে গেল। তাকেও প্রচার-কাজ চালাতে হবে, যাতে আরও বেশী 'কনভার্ট' করা যায় তার জন্য মাঝি ওঁরাওদের মাঝে গিয়ে সুযোগ নিতে হবে! আরুলাস্থানের আপত্তি এইখানেই। গরীব মাঝি ওঁরাওদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের বাধ্য করতে হবে এই পথে আসতে—এটা অন্যায় বলেই মনে হয়। ব্রুমফিল্ড সাহেব কোনদিনই তা করেননি। সবরকম সাহায্য করতেন তিনি মাঝি ওঁরাওদের বিনা স্বার্থেই। বলতেন তিনি —আমাদের ধর্ম মানুষের সেবা করা, মানুষের মঙ্গল করা; দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর জর্ডনের জল ছিটিয়ে দেওয়া নয়!

কথাটা বলতেই হেডউড সাহেব চটে ওঠে—**Stop it I say, I know my business.**

নীরবে তার ঘর হতে বার হয়ে আসে আরুলাস্থান। এখানকার অন্ন তার আজ না হোক বেশীদিন থাকবে না তা সে বুঝতে পারে। না থাকুক, হয়ত তাহলে সে মানুষের মত বাঁচতে পারবে, কিছু করতে পারবে!

সকালের রোদ মিশনারি হোমের টালির ছাদে রং লাগিয়েছে,

বরাকরের বিস্তীর্ণ বালুবেলায় বসেছে বনচড়াইয়ের স্নানযাত্রা, ঝটাপটি করছে পাখিগুলো। ঝাউগাছের পাতার বুকে পাহাড়ি বাতাস তুফান তুলেছে। হঠাৎ কাঁকর-বিছানো পথ দিয়ে চাঁদকে মিশনারি হোমে ঢুকতে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়, শালুকচাপড়ার সুন্দর মাঝির ছেলে চাঁদ ·· এসময়ে তার আসার কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না সে! হেডউড সাহেবকে একটু পরে তার সঙ্গে বের হয়ে যেতে দেখে আরও ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে ওঠে তার কাছে!

বরাকর নদীর পাশ দিয়ে আটাড়ি পলাশগাছের জঙ্গলের মধ্যে তারা দুজনে অদৃশ্য হয়ে যায়। খানিক পরেই চড়াইয়ের মাথায় দেখা যায় দুজনকে···বাঁশগড়া কলিয়ারির পথটা ধরে চলেছে দুজনে। সাহেবের ঘোড়াটা আগে আগে, পিছনে চলেছে চাঁদ।

স্বার্থের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ যেখানেই থাকে···মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে কেন্দ্র করে। হেডউড আর চাঁদের মধ্যেও একটা যোগাযোগ ঘটেছিল, দুজনেই হাত মিলিয়েছিল দুজনের স্বার্থে।

মাঝি ওরাঁও মহলে চাঁদের খানিকটা সম্মান প্রতিপত্তি আছে। হেডউডের তাকে প্রয়োজন। সাঁওতাল সমাজে শিকড় বসাতে গেলে চাঁদকে হাতে রাখতে হবে। সুন্দর মাঝি সাহেবকে তাদের বাড়ি আসতে দেখে ত অবাক হয়ে যায়! হৈ চৈ শুরু করে। ডুংরীর মাঝি মেঝেনরাও এসে পড়ে। একটা চারপাইএ বসে রয়েছে সাহেব। চাঁদ সুন্দর কি করবে কোনদিকে যাবে কিছুই হদিশ করতে পারে না। হাসে সাহেব —বোস বোস চাঁদ, টুমার পিটাকে ভি বসটে কহ। I am all right.

একঘটি কাঁচা সফেন দুধ এনে নামায় সুন্দর মাঝি।

ঘুরে ঘুরে তাদের ডুংরীর সমস্ত কিছুই দেখে যায় সাহেব। চাঁদকে

বলে—**You must meet me**, আবার ভেট্ করবে টুমি। হামি কনর‍্যাড সাহেবকে letter দেবে।

চাঁদ ঠিক জায়গাতেই ঘা মেরেছিল। সাহেবকে ধরে কলিয়ারি ম্যানেজারদের হাত করতে পারলে বেশ কিছু অর্ডার পাওয়া যাবে। এবং তার ধারণা সত্যিই। সাহেবকে এগিয়ে দিতে আসে বাপ বেটা, ডুংরীর অনেক সাঁওতালই। উৎসুক নয়নে সাহেব চেয়ে দেখে এদের জীবনযাত্রার নগ্ন রূপ। ঘর-উঠোনগুলো নিকোন গোবর দিয়ে, ছোট ছোট মটকি বাঁশের ঝাড়গুলো বাতাসে মাথা নাড়ছে। উলঙ্গ ছেলেগুলো নধর দেহ নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে চেয়ে দেখছে। মাথা নেড়ে শিষ দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে সাহেব। আর্তনাদ করে ওঠে—হঠাৎ সামনে একজন মাঝিকে বিশাল একটা সনাতন সাপ মেরে ঝুলিয়ে আনতে দেখে! রোদে চিকচিক করছে লম্বা সাপটা।

My God!

বলে চাঁদ, ও কিছু নয় সাহেব, খাবেক কিনা তাই মেরে এনেছে।

What! **Snake-eaters?** আদমি লোক সাপ খাবে?

ওরা খায় বটে, বুনো লোকে উসব খায়।

সাহেব এগিয়ে চলে। বুড়ো লাটু মাঝি কথাটা শুনতে পায়, বলে ওঠে চাঁদকে—

তুর বাবার জন্যে সাতপাহাড়ির বনে একটোও সনাতন সাপ আর ছিল নাই রে চাঁদ, তু আজ মানুষ হইছিস পারা!

লাটুমাঝির দিকে একবার মুখ তুলে চাইল চাঁদ। কোন কথার জবাব দিল না।

রাত্রি বেলাতে হেডউড সাহেবের ডাকে ধড়মড় করে ওঠে আক্-

লাস্থান। সাহেব তৈরি হয়ে বার হয়েছে, এখুনিই তার সঙ্গে যেতে হবে, কাছাকাছি একটা কলিয়ারি বাংলোতে বিশেষ জরুরি ব্যাপার। চোখ কচলাতে কচলাতে মনের বিরক্তি চেপে আরুলাস্থান মুখ হাত ধুয়ে পোষাক পরে নেয়। আজ হেডউড সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছে। পাহাড়ি পথটা বেয়ে চলেছে দুজনে আর কলিয়ারির দুজন বন্দুকধারী সেপাই। ঘোড়ার খুরের শব্দ নিস্তব্ধ পর্বতের বুকে প্রতিধ্বনি তোলে। আবছা চাঁদের আলোয় গাছের চারাগুলো দীর্ঘতর হয়ে স্বপ্ন দেখছে। মা কল্যাণীর আবছা ছায়াঘন মন্দিরের চারিপাশে বট অশ্বত্থের জটলা পিছনে ফেলে রেখে তারা এগিয়ে চলে দূরে চড়াইয়ের বাঁকে···কলিয়ারির আলোগুলো দেখা যায়।

·· স্তম্ভিত হয়ে যায় আরুলাস্থান, ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে পারে না। কলিয়ারির পারমিট-ম্যানেজার খুন হয়েছে। সাহেবের মৃতদেহটা বাংলোর ভিতরে ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে, মোমবাতি জ্বলছে চারিপাশে। কালো পোষাক পরা আরও কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ-পুঙ্গব ঘোরাঘুরি করছে। হেডউড সাহেব গিয়ে যথারীতি বাইবেল খুলে তৈরি হয়ে নেয়।

একটা মারাত্মক-রকম আহত মালকাটাকে ঘিরে কয়েকজন কুলি-কামিন কাঁদছে। একটা ময়লা কালিমাখা কাপড় ঢাকা দিয়ে পড়ে রয়েছে সেটা গেটের বাইরে, মাঝে মাঝে কাপড়খানাতে রক্তের কালচে দাগ। একটা অল্পবয়সী মাঝি মেয়ে কাঁদছে ব্যাকুল ভাবে। তারই স্বামী হবে বোধ হয়। আহতের মাথায় বেশ একটা গভীর ক্ষত। রক্ত জমাট হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে লোকটা গোঙায়—জল, জল!

ধমকে ওঠে জমাদার—চুপ বে শালা শূয়ারকা বাচ্চা!

ঝিমিয়ে আসছে লোকটা, হয়ত শেষই হয়ে যাবে।

দারোগাবাবু আসতে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। লোকটা চোখ বুজে রয়েছে। চীৎকার করে জমাদার—

আবে শালা ! লাঠির খোঁচা দিয়ে তাকে ঠেলে তোলবার চেষ্টা করে, ছুঁতেও ঘৃণা বোধ হয়।

আরুলাম্বান এগিয়ে যায়, তার সারা মনে সেই তীব্র জ্বালা দেখা দিয়েছে—

এমনিতেই ও মরে যাবে ! প্রথমে **medical aid** দেন, তারপর বিচার ত আছেই !

ব্যাটা খুনী, খুনই করে ফেললে স্রেফ ? ওসব ন্যাকামি ! দারোগা সাহেব গজগজ করতে থাকেন।

লোকটা ইতিমধ্যে খানিকটা সামলে নিয়েছে, মাঝি মেয়েটা দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে, দুচোখে তার ব্যাকুল মিনতি।

এ্যাই ! কী হয়েছিল সাহেবের সঙ্গে ?

লোকটা হাঁফাচ্ছে ! সমস্ত শক্তি একত্র করে বলে ওঠে—তুই বুল দারোগা বাবু, মদ খেয়ে তুর বহুকে কেউ যদি বেইজ্জৎ করে গালমন্দ দেয়, তু জুল জুল করে ভাল্‌বি ? সাহেবকে রুখতে গেলাম, আমারই দা উঠিয়ে আমাকে কুপিয়ে দিলেক ! বৌটোর কান্না আর রক্ত দেখে ক্ষেপে গিইছিলাম, গাঁইতি দিয়ে উয়ার মাথাটো চেলাই দিলম বটে ! দুব নাই ? বুল তুরো ?

উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে লোকটা। মাথার কাটা জায়গাটা দিয়ে খানিকটা তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ে, গেটের পাঁচিলে হেলান দিয়ে বসে। চোখ বুঁজে আসে ওর। মেঝেনটা কাঁদছে।

সাহেবের দেহটা যথারীতি গোর দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল, ফাদার হেডউড প্রথম একমুঠো মাটি দিলে তার গোরে, তারপর অন্যান্য সাহেবরা। আরুলাম্বানকে কেউ ডাকেনি মাটি ফেলতে—কালো সাঁওতালের হাতের মাটির ভার যে ওদের প্রাণকে নিঃশেষ করে দেবে ! হেডউড জানত আরুলাম্বান খৃষ্টানও নয়। একটা গরুর গাড়িতে করে অচেতন আহত

সাঁওতালটা আর মেঝেন মেয়েটাকে থানায় চালান দেওয়া হলো, দাঁড়িয়ে দেখল আরুলাম্থান। লোকটা মরবে নির্ঘাৎ এবং এদের গাফিলতির জন্যই মরল।

মরা সাহেবের সৎকারের আয়োজনের এক অংশও যদি এই আহত লোকটার জন্য করত তাহলে হয়ত বাঁচত লোকটা। সান্ত্বনা দেয় আরুলাম্থান মেঝেনকে—এখান থেকে গেলেই উ বাঁচবেক, তুই-ও। কিন্তু ইখানে আর ফিরে আসিস না।

চোখ মুছতে মুছতে মেয়েটা বলে, ইরো? আবার? আর লয়!

হেউডড সাহেব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আরুলাম্থানের দিকে চেয়ে রয়েছে। খুনী লোকটার ওই মেয়েটার সঙ্গে কি এত কথাবার্তা বলছে সে? আজকাল তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে হেডউড সাহেব। কেমন যেন বদলে যায় আরুলাম্থান, গম্ভীর হয়ে ওঠে ওর মুখ চোখ। মনে মনে কি যেন ভাবে।

Arulanthau—Come up my boy!

সাহেবের মিষ্টি ডাকে একটু চমকে ওঠে আরুলাম্থান। ছুটে আসে —Yes Sir!

Let's go now.

ঘোড়া দুটো নিয়ে দুজনে বার হয়ে পড়ে রাস্তায়।

আজ সাহেব আরলাম্থানকে আগে যেতে দিয়ে নিজে চলেছে পিছু পিছু। কে জানে, কলিয়ারি ম্যানেজারকে যখন একটা মাঝি খুনই করতে পেরেছে, তখন একজন ফাদারকেই যে আরুলাম্থান খুন করবে না তারই বা কী মানে আছে?

মনে মনে হাসে আরুলাম্থান, সাহেবের মনের দুর্বলতা টের পেয়েছে সে। হঠাৎ বলে ওঠে, **Ripe plums, father; will you have some?**

No, thanks.

রাশি রাশি পাকা বনকুলের হলদে লাল রংএর আস্তরণ সবুজ গাছের পাতায় পাতায়। অন্যদিন মাঝে মাঝে তারা তুলত, কাঁটার মধ্যে দিয়ে হাত পুরে টপ টপ করে আরুলাম্বান তুলে আনত ঘোড়া থামিয়ে। হেউডড সাহেব কতক মুখে পুরত,কতক পকেটে নিয়ে আবার চলত তারা। আজ কোনরকমে তাড়াতাড়ি মিশনারি হোমে ফিরতে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হন তিনি।

আরুলাম্বান ছোট ঘোড়াটার দুদিক লম্বা দুখানা পা ছেড়ে দিয়ে হেলে দুলে শিষ দিয়ে গান করতে করতে চলেছে। হেডউড সাহেবের মুখে নেমেছে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘের ছায়া।

আরুলাম্বান খুসী হয়েছে, লোকটা তবু প্রতিবাদ করে মরছে। আশপাশের কলিয়ারিতে ওদের অত্যাচার হয়ত খানিকটা কমবে এতে!

ছাতা পরবে ডুংরীতে হৈ হৈ লেগেছে। বনতল পাহাড় মাদল টিকারার শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে, আগামী বর্ষার আগমনী গাইছে তারা। শাল তলায় একটা গোঁজকে ঘিরে ডুংরীর মেয়ে ছেলেরা নাচ গান শুরু করেছে। আশেপাশের ছোট গ্রাম থেকে ফিরিওয়ালারা এসেছে বেলোয়ারি চুড়ি ঘুনসি-মালা নিয়ে। ফুটকলাই, গুড়ের মিঠাই, তেলেভাজা, ভাবরা বোমারও দোকান বসেছে। ওপাশে বসেছে হাঁড়িয়া নিয়ে একজন লোক, মাছি ভন ভন করছে। একটা হাঁড়ির গায়ে ফুটো করা আছে, আগাম পয়সা নিয়ে লোকটা খদ্দেরকে হাঁ করে বসতে বলে, হাঁড়িটার মধ্যে মাপমত হাঁড়িয়া মদ পুরে নিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে আঙুলটা সরিয়ে নেয় ছিদ্রের মুখ থেকে, জলধারার মত উপর থেকে মদ পড়তে থাকে লোকটার মুখের মধ্যে একেবারে গলার কাছে, গিলে

চলে সে। বেদম হয়ে যাবার আগেই হাত নেড়ে ইসারা করতে মদওয়ালা ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। একটু দম নিয়ে আবার শুরু হয় প্রক্রিয়াটা।

পরণে হলুদ-রাঙা কাপড়, পায়ে মল হাতে বাজু বৈঠা, বেণীতে কুর্চি ফুলের স্তবক গুঁজে কোমর ধরাধরি করে গান গেয়ে চলেছে মেয়েরা। বুধন মাঝখানে মাদলটা বাজিয়ে চলেছে, টিকারায় ঘা দিচ্ছে বাদলমাঝি। বাঁশীর সুরে গেয়ে চলেছে তারা, মাদলটা বাজছে—

ধিতাং ধিতাং তাং

উতুর তুয়া তুতুর তুয়া

বাজে বাঁশীর ধূয়ারে,

মাদল বাজে ধিতাং ধিতাং তাং

বাঘের ডরে খিল আটিলাম ডুংরী ঘরে দুয়ারে

মন যে বুলে ভাঙ্‌রে আগুড় ভাঙ্‌।

মাদলটা তেহাই দেয় তাং তাং তাং গুর-রু-রু তাং।

ওপাশে লোক জমেছে বেশী, ডাগর মোরগগুলোর পায়ে ধারালো কাতান বেঁধে গলা তুলে মাঝে মাঝে ডাক দিচ্ছে, রোদের আভায় তেল-চিকচিকে গা-গুলো ঝিলিক মারে···দুটো মোরগ লড়ে চলেছে···

পূর্ণ বিক্রমে ডানা মেলে···কাতান বাঁধা পা খানা এগিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ে ওপাশের ষাঁড়াটার উপর, ক্ষিপ্রবেগে পাশ কাটিয়ে সরে যায় সে।

সাবাস দিয়ে ওঠে মাঝিরা। পরক্ষণেই ঘুরপাক খেয়ে ষাঁড়াটা লাফিয়ে পড়েছে মোরগটার গায়ে, তীক্ষ্ণ কাতানটা বসে গেছে আমূল ওর বুকে! তাজা মোরগটা পড়ে গেল···ঝলকে ঝলকে রক্ত বার হয়ে আসে, স্তিমিত হয়ে আসে ওর নিষ্প্রভ চোখের চাহনি, দেখতে দেখতে

তাজা ষাঁড়াটা ঘাড় কাৎ করে পড়ে গেল। নোটনের সেরা ষাঁড়াটা খতম হয়ে গেল, বিজিত পক্ষ মরা মোরগটাকে তুলে নিয়ে নৃত্য করতে লাগল। গজ গজ করে লোটন বুধীকে সামনে দেখে—

হলো ত! তুকে বললাম আসিস না, মেয়ে হয়ে এলি লড়াই দেখতে, সব 'কু' হয়ে গেল। তুর লেগেই ষাঁড়াটা গেল বিবাক।

মেয়েছেলেদের মোরগ-লড়াই দেখতে নাই, নাহলে এত তেজী মোরগটা কাৎ হয়ে যায়! বুধী বকুনি খেয়ে সরে গেল।

/

হেডউড সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদ সুন্দর আর কয়েকজন এসেছে ভালুক-চাপড়া থেকে পরব দেখতে। আরুলাস্থানও আছে। রাঙামাঝি পরম সমাদরে বসাল তাদের। সোয়ী চাঁদকে দেখে কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে, লজ্জায় ঢেকে আসে তার দেহ। নাচের আসর থেকে সরে যায় সে, চাঁদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নেয়— অজ্ঞাতেই খেলে যায় তার মুখে একটু হাসির আভা। হেডউড সাহেব মাথা নাড়ছে ওদের নাচ দেখে।

···নাকরা লাগড়চির শব্দে সকলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রকাণ্ড একটা জায়গাকে মোটা মোটা শালরোলা দিয়ে ঘেরা হয়েছে, একটা কালো বিশাল মোষকে ঢোকান হয়েছে সেখানে। শিঙে তেলসিঁদুর মাখান, যমবাহন টিকারার শব্দে মাঝে মাঝে লাল চোখ তুলে গর্জন করে সামনের পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, শিং নামিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে রুদ্ধ আক্রোশে।

ওরে বাব্বা, ই যে বিষম কাঁড়া, শালো পব্বত!

লড়বার লোক পাওয়া যায়না, এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। রাঙা সর্দার বলে ওঠে—

তুরা লার্‌বি তবে বললি কেনে?

হাঁসপাহাড়ির ডুংরীতে লড়ুইয়ে পালোয়ান কেউ নাই, সোয়ী ডাগর

চোখ তুলে চাঁদের দিকে চাইল। চাঁদের সারা দেহে মনে একটা চাঞ্চল্য আসে। বলিষ্ঠ পেশীগুলো যেন নড়ে ওঠে। জামাটা খুলে কাপড় সেঁটে সে তৈরি হয়ে নেয়।

তু লড়বি?

হুঁত কি? বেড়া গলে সে ঘেরার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সকলেই সাবাস দিয়ে ওঠে, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সোয়ী। টিকারায় ঘা পড়তে থাকে, গুম—গুম···উ···ম্···

লাগড়চি কাঁসির শব্দে জায়গাটা মুখর হয়ে ওঠে। মোষটা লেজ উপর দিকে তুলে মাথা নামিয়ে ছুটে আসে এক চাপ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত, বিশাল দেহের সমস্ত ওজন সামনের পায়ের উপর দিয়ে তেড়ে আসছে—গাঁ ও···ক্···

চকিতের মধ্যে পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়ায় চাঁদ। বলিষ্ঠ পেশীগুলো ঘামে ভিজে গেছে, গলার হিংলাজের মালাটা দোল খাচ্ছে তার পায়ের তালে তালে। হেডউড সাহেব মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে রুদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

হঠাৎ কোন্‌দিকে কি হয়ে যায় বোঝা গেল না। মোষটা তাড়া করে এসেই থমকে দাঁড়াল, চাঁদ আগে থেকেই সরে গেছে। মোষটা সমস্ত শক্তি একত্র করে আবার চাঁদের দিকে ছুটে আসছে, একেবারে এসে পড়েছে তার সামনে! লোকজন চীৎকার করে ওঠে! চাঁদও অন্য উপায় না দেখে শিং দুটো চেপে ধরে। তেলমাখানো শিং হাত থেকে পিছলে যেতেই মোষটা তাকে মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে দেয় আসমানে। গোটা দুয়েক পাক্ খেয়ে ছিটকে পড়ে চাঁদ পাথরের উপর কপাল ঠুকে। মোষটা আবার ছুটে চলে তার দিকে। হাঁটুতে চোট লেগেছে, উঠবার চেষ্টা করে চাঁদ, পারে না; চোখের সামনে দেখে কালো পর্বতপ্রমাণ মোষটা সাক্ষাৎ যমের মত ছুটে আসছে লাল ধুলো উড়িয়ে! সমবেত জনতা আর্তনাদ করে

ওঠে, মোষটা মারমুখো হয়ে ক্ষেপে গেছে,—শিংএর আঘাতে তালগোল পাকিয়ে দেবে এইবার! মাথা নীচু করে পড়ে রয়েছে চাঁদ, টিকারা লাগাড়চি থেমে গেছে। ছুটোছুটি পড়ে গেছে চারিদিকে!

কোন্‌দিক থেকে ফুকন প্রবেশ করে কেউ টের পায়না, বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে মোষটার নাক বরাবর একটা প্রচণ্ড আঘাত করে সরে যায় সে। মোষটার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, নাকের নরম জায়গাটা থেকে রক্ত পড়ছে। গর্জন করে তেড়ে যায় ফুকনের দিকে! ফুকন মোষ চরিয়েছে বহুকাল থেকে, সুতরাং ওদের মতিগতির সব খবরই সে জানে। ফাঁক দিয়ে বার হয়ে গিয়ে আবার এক আঘাত বসিয়ে দেয় ওর নাকের উপরই। পিছু হটতে থাকে মোষটা। নাকে মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। ওর মারমূর্তি যেন স্তিমিত হয়ে আসে। হাঁফাচ্ছে সে দূরে দাঁড়িয়ে, গর্জন তবু তার থামে নি। কয়েকজন লোক ইতিমধ্যে চাঁদকে বার করে নিয়ে গেছে।

মোষটা আর এগোয় না, ফুকনেরই জয় হল। কাড়া-টিকারা লাগাড়চি আবার বেজে ওঠে—একটা লালজবা ফুলের মালা পরিয়ে দেয় রাঙা সর্দার তার গলায়। সোয়ীকে দেখা যায় না ভিড়ের মধ্যে।

নীরবে বার হয়ে আসে ফুকন। মালাটা খুলে ফেলে দেয় মাটিতে, নীরবে এগিয়ে চলে ডুংরীর দিকে। পলাশতলার কাছে হঠাৎ কার ডাকে ফিরে চাইল। আরুলাস্থান এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখে —সাবাস! একটা সিগারেট তার হাতে দেয়।

ফুকন সিগারেটটা ধরিয়ে টানতে থাকে। আরুলাস্থান তাকে নিয়ে এগিয়ে যায় কাঁইজোড়ের দিকে···জিজ্ঞাসা করে,

সোয়ী কোথায়?

মুখ তুলে চায় ফুকন, তার বিয়ে হয়ে যাবেক—ওই যে চাঁদ, ওই ওয়ারই সাথে।

হুঁ! আরুলাম্বান যেন একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে। বলে চলেছে ফুকন—চাঁদের নাকি অনেক পয়সা, আমি কুথায় পয়সা পাব তাই বিহা হবেক নাই। উয়ার সাথেই হবেক।

কথাগুলোর মধ্যে আরুলাম্বান লুকান একটা ব্যথার সন্ধান পায়।

কেনে গেলি উকে বাঁচাতে, আজ কাড়াতেই শেষ করত!

ফুকন বিস্মিত হয়ে যায়—সি কি করে হবেক! আমাদের গাঁয়ে আইচে, লুকটা মরবেক খামোকাই! আর সোয়ীর সাথে বিহা হলে সোয়ী সুখেই থাকবেক, আমার কি রইছে বুল যি উকে খাওয়াতে পারব! সোয়ী ভালো থাকুক, তাতে আমার কি মন্দ হবেক?

হাসে আরুলাম্বান, কিছু বলে না; আবেগ ভরে ফুকনের কাঁধ চাপড়াতে থাকে।

পরবতলার কোলাহল কমে আসছে।

আরুলাম্বান হেডউড সাহেবকে খুঁজতে যায় ভিড়ের দিকে। ফিরতে হবে আবার তাদের।

হেডউড সাহেবের সুপারিশের জোর আছে, কয়েকটা কলিয়ারি থেকে শালরোলা সাপ্লাইএর অর্ডার পেয়েছে চাঁদ। বাংলো থেকে বার হয়ে আসবার সময় হতেই মনে মনে স্বপ্ন দেখে সে···অমনি মটরগাড়ি···বাংলো সে করেছে, পাহাড়ের নিচে বনের মধ্যে ডুংরীতে আর বসবাস করবে না। জীবনের পথ হবে অন্য।

গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গেই কাঠ কাটা শুরু হয়ে গেছে। ঘন জঙ্গলগুলো আড়াই হাত দাঁড় দিয়ে মেপে কাটতে লাগিয়েছে চাঁদ। মাথার উপর চড়া

রোদ বেড়ে চলে। কুঠারের আঘাতে মড় মড় করে ভেঙে পড়ে গাছ-গুলো। ডালপালা কেটে গাড়ি বোঝাই করে ওপাশের শুকনো রসমরা কাঠগুলো। মহুয়া, ভালাই, নিম গাছ দু-একটা শালবনের ফাঁকে ফাঁকে কি করে জন্মেছে, বড় হয়ে উঠেছে; দু'একটা শিরিষের গাছে এসেছে ফুলের মঞ্জরী। পত্রহীন ভালাই গাছের মাথায় থলো থলো হলদে ফলগুলো ঝুলছে, পেকে উঠেছে ওগুলো; ডালটা নাড়া দিতেই পড়ে। শুকনো পাতার উপর আগুন ধরিয়ে আধপোড়া ফলগুলো খেতে বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগে। চাঁদ ঘুরে বেড়াচ্ছে বনের মধ্যে। কাঠ-বোঝাই গাড়ি-গুলো বনের বাইরের দিকে কাঁকর বালি-ঢাকা পথ দিয়ে এগিয়ে চলে। নীরব বনভূমি মাঝে মাঝে ময়ূরের ডাকে ভরে ওঠে। বর্ষার আগেই গাছ কাটা শেষ করতে হবে, নাহলে আর এবছর কাজ এগোবেনা; রাত্রি দিন তাই চাঁদ বনেই রয়েছে। বুনো মাঝিদের একটা বাড়িতে বাস করছে কদিন। সারাদিন কাটে বনের মাঝে, কাঠের হিসেব করে আর গাড়ি বোঝাই করে। রাত্রিবেলার নিস্তব্ধ পরিবেশ, বনের স্তব্ধ নিবিড়তা তাকে উন্মাদ করে তোলে। আদিম মানুষের রক্তে বন্য আদিম পরিবেশ আনে উন্মাদনা। বারবার সোয়ীর কথা মনে পড়ে। ঘুম আসে না। দূরে কে যেন আগুনের পাশে বসে বাঁশী বাজায়।

তুরীকে দেখে থেকে চাঁদ কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। শালগাছ-গুলোর পাতা তুলছে তুরী, হঠাৎ চাঁদের ডাকে ফিরে চাইল—'বনদার' বলে চাঁদ পরিচিত এখানে।

কি ?

শুন্।

এগিয়ে আসে মেয়েটা। নিটোল পুরুষ্টু গঠন, ছোট কাছা কাপড়খানা তার দেহের গুরুভার বইতে পারে না। চাঁদের চোখে বন্য নেশা, তুরী বুঝতে পারে তার লালসামদির চাহনির অর্থ।

বিহা করিস নি এখনও কিনা? হাসছে তুরী, চোখের কোলে দুষ্ট হাসি। চাঁদের কাছে বনের আবছা আলো-আঁধারি যেন নেশা নিয়ে আসে। চারিপাশে ঘন শাল আটাড়ি বনের প্রহরা, দু'একটা মৌমাছির গুণগুণানি ছাড়া আর কোন প্রাণের স্পন্দন নাই। সামনে দাঁড়িয়ে তার পূর্ণযৌবনা এক নারী। তুরীকে টেনে নেয় তার কাছে।

ছাড়, কেউ দেখে ফেলাবেক!

চাঁদের উষ্ণ স্পর্শ তুরীর যৌবননদীর বাঁধ ভেঙে দেয়। বাধা দেবার চেষ্টা করে না তুরী, চাঁদের প্রবল আকর্ষণে নিজেকে সঁপে দেয়। চাঁদ বলে চলেছে—

তুকে লিয়ে যাবো তুরী, যাবি আমার সঙ্গে? বিহা করব তুকে।

ধ্যাৎ—মিছে কথা বুলছিস!

না-না-না।

তুরী চাঁদের দৃঢ় বাহুবন্ধনে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়।

আদিম বন্য রক্তে নেশা লেগেছে দুজনের; সবকিছু মুছে গেছে তাদের মন থেকে। তুরীর চোখে আজ চাঁদের বুজে আসা কামনাবিভোর চাহনি। বনতল নিস্তব্ধ হয়ে আসে···বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে ভেসে আসে কাদের উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ।

একটা ময়ূরীর পিছনে দীর্ঘ পুচ্ছ টেনে চলেছে একটা ময়ূর···কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বনের ফাঁক দিয়ে কি দেখছে তারা।

তুরী স্বপ্ন দেখে···বনদার তাকে বিয়ে করেছে—নিয়ে চলেছে সহরে।

তুরীর আজকের আত্মসমর্পণের আগের ইতিহাসটুকু অত্যন্ত নিপুণ হাতে রচনা করেছিল নিয়তি। প্রথম যেদিন এই ছাতারকানালীতে আসে চাঁদ, সকলেই তাকে মেনে নিয়েছিল। বনের অন্তরতম প্রদেশে এসে যদি কারণে অকারণে কেউ কাঁচা পয়সা, কাঁচের মালা, হিংলাজের

ছড়া বিলোয় তাকে সহজে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না। চাঁদকে এরা পারে নি।

মাঝি-মেঝেনদের বনে কাঠ কাটার জন্য রোজ দিয়েছিল চার আনা করে—অবশ্য স্বরযবাবুর হিসেবে লিখেছিল আট আনা। তাছাড়া ছেলে-মেয়েদের বিলিয়েছিল কাঁচ, পুঁতির মালা, টাপ।

তুরীকে প্রথম দিন দেখে থেকেই কেমন যেন একটা বুভুক্ষা অনুভব করেছিল সে, চাঁদের স্বভাবজাত নারী-মাংসের ক্ষুধা। ওর বাবা বহা মাঝিকে তাই করে দিয়েছিল কাঠকাটার সর্দার,—রোজ দিত দশ আনা। সেই কৃতজ্ঞতার জন্য বহার বাড়িতেই সে থাকত, তুরী সেবা যত্ন করত তাকে।

চা করতে জানিস তু?

উহুঁ, মাথা নাড়ে তুরী চাঁদের কথায়। চায়ের সংবাদ বনের অত্যন্ত-প্রদেশে পৌছয় নাই।

জল চাপা গাড়াতে, ফুটে উঠলে আমাকে ডাকিস।

কৌতূহলভরে চেয়ে থাকে তুরী বনদারের চা নামক বিচিত্র এক পদার্থ তৈরির দিকে। হয়ে গেলে তাকে খেতে দেয়, চোখ কপালে তুলে বলে সে—

উরে বাস্‌রে, উ কি খেতে পারি, উপ্‌ জ্বলন্তটো জুড়োক তবে ত!

হাসে চাঁদ, গরমই খেতে হয়, এই দেখ্‌ কেনে?

বনদারের বিচিত্র কৌশলের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে তুরী।

এমনি করে দিনের পর দিন তুরীর সহজ সরল মনে বৈচিত্র্যের ঝড় তুলে তাকে বিভ্রান্ত করেছিল চাঁদ, তুরীর চোখের সামনে রচনা করেছিল এক বিচিত্র জগৎ।

যাবি আমাদের উরো?

সি কি করে হয়?

লিয়ে যাবো তুকে !

ওয় বাবাগো, বনদার বলে কিগো, লিয়ে পালাই যাবা নাকি আমাকে ?

হেসে চাঁদের গায়ে ঢলে পড়ে, চাঁদের সমস্ত শিরায় শিরায় বইতে থাকে অজানা শিহরণ ! তুরীর চোখে কোন্ মদির নেশা, কণ্ঠে বন-পাহাড়ির চিরন্তন মিলনগীতি দংসিড়িংএর সুর! তুরীর হাতটা চেপে ধরে—প্রবল বেগে টানতে থাকে তাকে নিজের দিকে, ওর নিটোল নরম গালে এঁকে দেয় তার উষ্ণ ঠোঁটের চুম্বনরেখা। তুরী নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে—

কেউ দেখে ফেলাবেক···না—না --

নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাঁপাতে থাকে তুরী কি এক অজানা উত্তেজনায়। কী অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত এই শিহরণ !

বনহরিণীর ছন্দোময় গতিতে বার হয়ে যায় ঘর থেকে। চাঁদ তখনও প্রকৃতিস্থ হতে পারে নি। সারা মনে ছড়িয়ে পড়ে ওর দুর্বার নেশা—তুরীকে জয় করতেই হবে তাকে···তুরীকে তার চাই।

আজকের আত্মসমর্পণের প্রস্তুতিই করে এসেছে প্রতিদিনের কাজে চাঁদমাঝি।

বনের কাজ শেষ হয়ে আসছে, বিশাল শালরোলা গুলো ছোট ছোট গরু-গাড়ী বোঝাই করে ডুংরীতে চালান দেওয়া শেষ হলেই মাস আষ্টেকের মত নিশ্চিন্ত। ধারপাশের বনে কাজ শুরু হবে। তাগাদা দেয় চাঁদ কাঠুরে সর্দারদের।

কিছুদিন থেকেহেডউড সাহেব আরুলাম্বানকে যেন একটু অবিশ্বাসের

চোখেই দেখতে শুরু করেছে। একমাত্র সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজই আরুলাস্থান করে না, নিস্পৃহভাবে বসে থাকে না হয় মাল-কাটা কুলি মাঝিদের সঙ্গে কথা বলে। ওর মুখে চোখে ফুটে ওঠে কি একটা বিজাতীয় আক্রোশের ছাপ, হেডউড সাহেবের দৃষ্টি এড়ায় না।

সেদিন রঙ্গিলার হাটে হেডউড সাহেব লেকচার দিচ্ছে, আরুলাস্থান কোথায় যেন গেছে। হঠাৎ একটা চাঁই পাথর এসে পড়ল সাহেবের পাশে, পরক্ষণেই আবার একটা। হৈ চৈ পড়ে যায়। ছুটে আসে চৌকিদাররা, মাঝি মেঝেনরা একে একে সরে যায়। হেডউড সাহেব রেগে উঠেছে এই ব্যবহারে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে আরুলাস্থান, চীৎকার করে ওঠে সাহেব—**You swine, where had you been so long ?**

আরুলাস্থান কথা কয় না, গালটা নীরবে হজম করে। সেদিন আর লেকচার জমল না, পুলিশ কয়েকজন নিরীহ কুলিকে ধরে ঘা কতক দিয়ে ছেড়ে দিল। হেডউড সাহেব একজন চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলে হাটের বাইরে। পিছনে আসছে আরুলাস্থান। কে জানে কি বলেছে সাহেবকে কেউ হয়ত, চটে গিয়ে তাকেই গালাগালি দিলে সাহেব।

রাজ্য এবং প্রতিপত্তিকে কায়েমি করে রাখতে ইংরেজ কামান বন্দুক ছাড়াও এনেছিল মিশনারির দলকে। বন পাহাড়ের অন্তরালে অশিক্ষিত অন্ধকারময় সমাজের লোকদের আলোকে আনবার জন্য তারা সামান্য পয়সা, জামা-ব্লাউজ, কাঁচের মালা বিলোত আর জর্ডনের জল ছিটিয়ে দলবৃদ্ধি করে মহা আলোকের পথে নিয়ে যেত—পথ চেনাত কয়লা-কুঠির মাটির অতল অন্ধকারের। সাঁওতাল ছেলেদের প্রলোভন দেখানোর জন্য থাকত অনেক মিশনারি হোমে সাঁওতাল মেয়েও। ওদের এ্যাপ্রন পরিয়ে সিস্টার না হয় অন্য কোন নাম দিয়ে সেবাধর্ম বিলোবার জন্য রাখা হত। হাঁসপাহাড়িও বাদ যায় নি। ফাদার ক্রমফিল্ড এসবের

ধার বড় ধারতেন না। মিশনারি হিসেবে তিনি ছিলেন এদের রাজ-নীতিতে থার্ড গ্রেড। কিন্তু হেডউড আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আগেকার রীতিটা ফিরে এলো। মিশনারি হোমে মেয়েদের স্কুল খোলা হল ; ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বড় একটা দেখা গেল না কিন্তু আমদানি হল দুটি সিস্টার সাঁওতাল পরগণার মিশন হোম থেকে।

আরুলাম্থানকে দেখে মুখ টিপে হাসে ওরা। মিস্ ডেজিকে দেখে আরুলাম্থানও না হেসে পারেনি। মেয়েটা চালচলন সব কিছুতেই ফুটে ওঠে একটা বিশ্রী কদর্যতার ছাপ।

মিস ডেজি ! হেসে ওঠে আরুলাম্থান নামটা শুনেই। Excuse me, শুনেছিলাম 'ডেজি' একরকম সুন্দর ফুল। কিন্তু আপনার রং হিসেবে অপরাজিতাই হত আপনার ঠিক নাম।

অপরাজিতা ফুলের রং গাঢ় নীল-কালচে মেশান। কথাটা শুনেই চটে ওঠে সাঁওতাল মেম সাহেব—nonsense !

মিস্ ডেজি !

হেডউড সাহেবের ডাকে ফিরে চায় ডেজি। আরুলাম্থান দাঁড়িয়ে দেখে, ওদিক্ দিয়ে চাঁদ আসছে ঘোড়ায় চেপে। পিছনে একটা লোক বাঁকে করে দুদিকে ঝুলিয়ে নিয়ে আনছে দুটো ঝুড়ি, তাতে উঁকি মারছে নানা ফলমূল। তার পিছনে একটা লোক টানতে টানতে আনছে একটা পাঁঠাকে আর ঝুলিয়ে আনছে দুটো তাজা মোরগ। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে আসে চাঁদ, ফাদারকে অভিনন্দন করে, Good morning.

মিস ডেজি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে চাঁদের দিকে। চাঁদও এখানে ডেজির মত ধোপদুরস্ত কাপড় জামা পরা একটি সাঁওতাল মেয়েকে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

পরিচয় করিয়ে দেয় হেডউড। মাথা নাড়ে চাঁদ, নতুন এসেছেন ইথানে ? বেশ বেশ। থাকুন। ভাল লাগবেক আমাদের দেশ।

চাঁদের আনন্দ মুখ চোখ ফুটে বার হয়। ডেজিও মাথা নাড়ে, অর্থাৎ দেশটাকে দয়া করে নিশ্চয়ই একটু দেখবে এবং দেখবার জন্যই যেন বিলেত থেকে এসেছে।

আরুলাম্বানকে হুকুমের সুরে ডেকে নিয়ে সাহেব আপিসের দিকে চলল। চাঁদ আর ডেজি রইল একা,—প্রথম পরিচয়ের নেশা কাটিয়ে চাঁদ তখন ভাল করে ডেজিকে দেখতে চেষ্টা করছে। পুরুষ্টু গড়ন বটে, স্বাস্থ্য আছে।

হেডউড কদিন থেকেই কথাটা ভাবছিল। ক্রমফিল্ডের কর্মপদ্ধতি সবই যখন বদলে ফেলেছে তখন কেন আর আগেকার ওই মূর্তিমান বিদ্রোহকে জিইয়ে রাখা! এতদিনের ব্যবহারে আরুলাম্বানের যেটুকু পরিচয় সে পেয়েছে তাতে এই বুঝেছে যে পরম-পিতার কোন বাণী ও মানে কি না সন্দেহ, তবে এইটা জানে যে যারা ওই পরম-পিতার কথা বলে অন্তরালে ব্যবসাদারি করছে তাদের সে মানবে না। উল্টে সে তাদের ঘৃণা করে, বিজাতীয় একটা ঘৃণা।

আরুলাম্বান এখানে থাকলে আরও যাদের ও আনতে চায় তারা আসবে না লজ্জায় এবং ভয়ে। সুতরাং তাঁর নীতিবিরুদ্ধ কোন লোককেই সে আশ্রয় দেবে না। বিদায় ওই বিদ্রোহীকে করতেই হবে। তাই ছুতোয় নাতায় কোন একটা অজুহাত নিয়ে পড়তে চাইছিল এবং আজ হাটে তা পাওয়া গেছে।

চাঁদের সঙ্গে তার ব্যবসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। চাঁদ ভেট আনে, কাজ পায়। তাকে কলিয়ারির অর্ডার পাইয়ে দেবে, আরও প্রলোভনের নেশায় চাঁদকে ডুবিয়ে দেয় সাহেব, সব রকমের প্রলোভন। আরুলাম্বান থাকলে কোন্‌দিন সে চাঁদের ভুল হয়ত ভেঙে দেবে।

মিশনারি ফাদারের বনরাজ্য এবং মাঝিদের উপর দালালি স্বত্ব চাঁদের কাছ থেকে যাতে চলে যায় সে চেষ্টাও ও করতে পারে, তাই আরু-

লাম্বানকে মিশনারি হোম থেকে, এ অঞ্চল থেকে তাড়াতে চায় হেডউড।

দরজাটা বন্ধ করে গম্ভীর ভাবে আরুলাম্বানকে প্রশ্ন করে সাহেব—মিশনারি হোমের জন্য ধর্মের জন্য তুমি কি করিয়াছে?

একটু বিস্মিত হয়ে যায় আরুলাম্বান। মতলবটা অনুমান করে, তার সরে যাওয়াই উচিত এখান থেকে। বলে ওঠে, ধার্মিক আমি নই। মিশনারি হোমে চাকরি করছি, তার জন্য যেটুকু করা দরকার তাই করি। আমি নিজে খৃষ্টানও নই।

You are a betrayer !—বিশ্বাসঘাতকতা করছে তুমি!

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করে ওঠে আরুলাম্বানের। লোকটার তীক্ষ্ণ চোখ দুটোর দিকে চেয়ে জবাব দেয়—

এখনও করিনি, তবে ভাবছি এইবার করব।

What ?

লোকের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তুমিই সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকের কাজ করতে চাইছ। মেয়েটাকে কেন এনেছ, চাঁদকে কেন মিশতে দিচ্ছ ওর সঙ্গে?

I see ! তাই তুমি হাটে মাঝিদের আমাকে ইট মারতে লাগিয়াছিলে? **They brickbatted m**—

আরুলাম্বান বিস্মিত হয়ে যায়! তার এ প্রবৃত্তি কোনদিনই হয়নি, হবেও না। এমনি হীন একটা কাজে প্ররোচিত সে করতে চায় না। হেডউড সাহেব চীৎকার করে বলছে—**You helped those buggers !**

মিছে কথা ফাদার! একেবারে মিছে কথা।

What ! Am I telling a lie !

তুমি দেখেছিলে আমায় পাথর ছুঁড়তে?

I doubt !

হেডউড সাহেবের সঙ্গে আরুলাম্থানকে ঝগড়া করতে দেখে চাঁদ বিস্মিত হয়ে যায়, একটা নাম-পরিচয়হীন ছোটলোক মুখোমুখি ঝগড়া করছে সাহেবের সঙ্গে! বলে ওঠে চাঁদ,

এইখানকার ভাতে মানুষ হয়ে আজ সাহেবকে অপমান করছ তুমি?

সাহেব চাঁদের কথা শুনে ভরসা পায়, বলে ওঠে,

Look at his cheek! Bastard bugger, he dares challenge me!

বাস্টার্ড! আরুলাম্থানের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে পড়ে। চোখের সামনে ঘুরপাক খায় সারা আকাশটা, বাঁশগড়া কলিয়ারির নিহত সাহেবটার মুখ মনে পড়ে...হেডউডসাহেবের বিকৃত দেহটা অমনি হতে পারে...চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফাদার ক্রমফিল্ডের হাসিমাখা সৌম্য মুখখানা,...নিজের দুর্বার রাগ কোনরকমে চাপবার চেষ্টা করে।

তার মায়ের অতীত জীবনের পাপের বোঝা ভারী করেছিল ওদেরই জাতের একজন সে!

বলে ওঠে—**bastard**! আমার এই পরিচয় তোমার জাতের জন্যই মিঃ হেডউড! তোমাদের সভ্য জাতের গৌরবের পরিচয় বহন করছি আমি। আমার এতে লজ্জার কিছু নাই...আমার হাত ছিল না এতে! লজ্জার যা কিছু এতে সবটুকু তোমাদের জাতেরই পাওনা। তার থেকে তুমিও বাদ নও।

নেমে আসে আরুলাম্থান বাংলো থেকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সাহেব। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার মূর্তিটা, বাংলোর বাইরে নিস্তব্ধ হয়ে এল তার পায়ের সাড়া। চাঁদ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। ওপাশে নামানো রয়েছে মোরগ আর কলাবোঝাই ঝুড়িটা—খুঁটিতে বাঁধা ছাগলটা তোয়াজ করে একটা কলা চিবিয়ে চলেছে। কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

রাঙামাঝির অবসর নাই, সোয়ীর বিয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। জালা জালা হাঁড়িয়া আর মহুয়ার মদ তৈরি হচ্ছে ডুংরীর ঘরে ঘরে। চোয়ানো মদের গন্ধে আকাশ ভরে উঠেছে। গোটা তিনেক বেশ ডাগর ছাগলও এনে হাজির করছে রাঙা, দুটো বরাকে আলাদা করে রেখেছে, বোরেতের দিন বরযাত্রীদের দিতে হবে। তাছাড়া ডুংরীর সবাইকে খাওয়াবার ইচ্ছাও আছে। একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে, সে ভাল করেই খরচ করছে। সন্ধ্যা বেলা থেকে মাদল বাজিয়ে পাড়ার মেঝেনমেয়েরা গান শুরু করছে,—সিড়িংএর সুর বিয়ের একমাস আগে থেকেই শুরু হয়।

রাত্রি নিশীথে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, জেগে থাকে মাত্র একজন, সে ফুকন। আগুড়ের ফাঁক দিয়ে চোখ মেলে থাকে নির্মেঘ আকাশের পানে, চাঁদের আলোয় সাঁতার কেটে চলেছে হালকা মেঘের দল। নিস্তব্ধ বনের বুক থেকে ভেসে আসে ঝিঁঝি পোকার ডাক, ঘুম আসে না। তার জীবন যেন শূন্য হয়ে গেল। চাঁদের টাকা আছে, সোয়ীর উপর দাবীও তার আছে।

মাটি কেটে, পরের ক্ষেতে চাষ করে আর বনের কাঠ এনেই কি সে তার সমস্ত জীবন কাটাবে? কিন্তু কি করবে ঠিক করতে পারে না। রাতের পর রাত কেটে যায় তার চিন্তায়।

সাঁওতালদের সামাজিক জীবনটা জুড়ে আছে একটা আদিম সংস্কৃতির ধারা। কতকগুলো সংস্কার এবং দেবদেবীর স্থান সেখানে স্থায়ী। সর্বোপরি আছে সিঙি, বোঙা, পিতা-রূপী আলোকদেবতা, তারপরেই ঞিদা বা ধারতী মা—মাতৃরূপী আধারের দেবী। এঁরা দুজনেই তাদের আদি দেবতা।

তার পরেই নাম করা যেতে পারে মারাংবুরুর, ধ্যানগম্ভীর সমাহিত যোগী মহেশ্বরের সঙ্গে এঁর তুলনা করা যেতে পারে। ইনি এক'ধারে

ধ্বংস এবং সৃষ্টির দেবতা। সাঁওতালদের পূজা পার্বণে উৎসব অনুষ্ঠানে এঁরাও পূজা পান।

বন থেকেই তারা আহরণ করে তাদের ক্ষুধার অন্ন, বনজ ফল আর মাংস; তাদের পানীয় ওর ঝরণার ক্ষীরধারা—তাদের জীবনদাত্রীরূপিণী মা···তাঁর পূজাও করে ওরা।

প্রকৃতির বন্দনা গায়···প্রার্থনা করে আলোকদাতা পিতা সিঞ বোঙার কাছে···শ্যামল করে তোল এর পরিবেশ নব নব তরুরাজিতে··· ফুলে ফলে পূর্ণ হোক তারা···তোমার মেঘ সময়ে বর্ষণ করুক শান্তিবারি এর শিরে,···আমরা অতিথকে সৎকার করবো···সাথীকে ভালবাসবো।

'কারাম আগু' বা বৃক্ষরোপণ উৎসব তাদের সামাজিক থেকে সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হয়ে রয়েছে। নতুন বর্ষার কালো মেঘস্তূপ পাহাড়ের গায়ে মত্ত মাতঙ্গের মত লুটোপুটি শুরু করে···গড়িয়ে পড়ে এ-ওর গায়ে,···হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা দমকা হাওয়ার গতিতে কোথায় যেন পর্বতের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে···। বৃষ্টির ধারাপাতে আকাশের মেঘগর্জনে কেঁপে ওঠে বনপর্বত রাজ্য।

···এমনি দিনে ওরা ছেলেমেয়ে সেজেগুজে মাদলের শব্দে ভরে তোলে বর্ষার সজল মেঘমেদুর পরিবেশ। বৃক্ষরোপণ করে তারা সাদর আহ্বান জানায় শ্যামগম্ভীর বর্ষাকে।

বিয়ের আগে ডুংরীর হাটের মধ্যিখানে পাত্র চাঁদ মুখ ঢেকে পাগড়ী বেঁধে বসে রইল একটা হর্তুকী গাছের নীচে ছায়ায়। ছোট হাটে পসারীর চেয়ে কেনবার লোকই বেশী। পাহাড়ের গায়ে বট-অশ্বত্থ হর্তুকী বহড়া গাছের ছায়াঘেরা পরিষ্কার ঠাঁইটা ভরে গেছে লোকের ভিড়ে। হলদে রং করা কাপড় পিরান পরে বসে রয়েছে চাঁদ। সোমী এসে হাটের জনতার মধ্যে তার মাথার পাগড়ী খুলে দেবে, সর্বসমক্ষে

হবে সে পরিচিত চাঁদের বাগ্‌দত্তা বধূ বলে, ডান হাতে বাঁধবে কালো মঙ্গলসূত্র। অনুষ্ঠানের পর বর এবং কন্যাপক্ষ যে যার বাড়ি ফিরে যাবে গান গাইতে গাইতে বনভূমি মুখর করে।

চাঁদ প্রথমে এসব সামাজিকতায় যোগ দিতে চায় নি, তার রুচিতে বাধে। সুন্দর মাঝি ধমকে ওঠে—

তুর মাথাটা কি কাটা যাবেক ই করতে? সব্বাই করছে তু কেনে লারবি?

…শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয় বাপের ধমকে।

ফুকন হাটে এসেছে, নীরবে গাড়িখানা ছেড়ে দিয়ে একরাশ খেড়ো নামিয়ে বিক্রী করতে বসেছে। আনমনে উদাস দৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে পিঠ চুলকাতে থাকে, কেনাবেচায় তার মন নাই। সোয়ী আজ আনুষ্ঠানিক ভাবেই চাঁদের বৌ হতে চলল।

কত ডুবরে ছুটো খেড়ো, মিত পুইসা? (একপয়সা)

ফুকন যেন স্বপ্ন দেখছে…মাদলের শব্দটা তার কানে আসে। ওরা গাইতে গাইতে চলেছে…

বুরুরে নাতাল বহা ধিতাং ধিতাং নাতাল বহা…

…বসন্তের গান…মিলনের গান। নাতালফুলের শোভায় পাহাড় গেছে ভরে…বাতাসে প্রকম্পমান হলদে হলদে নাতাল ফুল…কার জীবনে আনে মিলনের মধুলগ্ন। তার জীবনে এল এই মধুমিলন-তিথিতে নিঃস্বতার স্পর্শ।

দূরে শালবনের আড়ে মিলিয়ে গেল হলদে রংছোপানো শাড়ী পরা মূর্তিগুলো…খোঁপায় ওদের বনফুলের স্তবক।

এ্যাই মাঝি!

লোকটার ডাকে ফুকনের চমক ভাঙে।

বিক্‌বি নাই ?

ফুকন বিকিকিনিতে মন দেবার চেষ্টা করে।

মেয়ের দল মারাংবুরুর পূজা দিতে গেল পাহাড়ের শিলাতলে

ডুংরীর সকলেই অবাক হয়ে যায়, বরাকর সহরে কেউ কেউ দেখে এসেছে এমনি আলো! বন পাহাড় আলোময় করে তুলেছে, মাদল-বাঁশি আর সানাইও বাজছে তার সঙ্গে। প্রায় দেড়শ সাঁওতাল এলো রাঙা-মাঝির ঘরে, চাঁদ বিয়ে করতে এসেছে। মাতব্বররা চুটি আর রাণীগঞ্জের তামাক পুড়িয়ে কাঁচা শালপাতায় গড়া চালাগুলো ধোঁয়ায় ভরিয়ে তুলল। সাঁইবুড়ো বিয়ে দিতে এসেছে একটা ঘোড়ায় চেপে। চাঁদকে মানিয়েছে চমৎকার, মেঝেনরা চেয়ে থাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে।

অয় বাবাগো—বাহারের লাগছে পারা উকে!

বুড়ি মেঝেন সটান মদ মেরে বটতলাতে বরের ঘোড়ার কাছে গিয়ে সুর করে গাইছে আর নাচতে শুরু করেছে—

আগা তুরু সাগা তুরু হুয়া গাড়ি চলেরে…

ধমক দিয়ে ওঠে নোট্‌না—ঘোড়ায় কামড়ে দিবে যি গো?

বুড়ি গর্জন করে ওঠে, তুকেই কামড়ে দিব কিন্তুক। করবি—করবি বিহা আমাকে, এ্যাই মিন্‌সে!

কুৎসিত রসিকতায় চাঁদও বিরক্ত হয়ে ওঠে। এসব রসিকতা তার ভালো লাগে না, চোখের সামনে ভাসছে ডেজির মার্জিত কথাগুলো, তার চোখের চটুল চাহনি।

বুড়িকে টেনে নিয়ে যায় লট্‌কা! সরে যা হুরুকে। লিখাপড়া জানা জামাই বটেক!

বুড়ির নেশায় পা টলছে। আনন্দের ফোয়ারায় বাধা পেয়ে বটতলায়

বসে কান্না জুড়ে দেয় সোয়ীর মায়ের জন্যে—ইবে তু কুথা রইছিস রে, তুর সোয়ীর লিখাপড়া জানা জামাই আইছে রে, উরে আমার বিটি রে! বংহার থানকে আয় রে!

এ্যাই—এ্যাই মাগী!

এগিয়ে আসে রাঙাসর্দার নিজেই।

যারে লট্‌কা, ইটোকে ঘরে পুরে শিকল দিয়ে দে ত, গাদাড়ে মদ মেরে ঠসক লাগাইছে কাজের সময়!

বুড়ির কান্নার সুর আরো বেড়ে উঠে—বিটিরে—

সোয়ীর মাথায় কুর্চি ফুলের গহনা, বলিষ্ঠ বাহুতে পৈছ-পায়ঁজোর, হলদে রং করা কাপড়খানা কালো দেহে সেঁটে বসেছে, চোখে তার নিষ্প্রভ দৃষ্টি। বিদেশী আলোতে চারিদিক ছেয়ে গেছে। নোটন, মংরু আদি সবাই এসেছে ডুংরীর ছেলেমেয়েরা, ভিড়ের মধ্যে নানা কাজে সবাই ব্যস্ত। রাঙা সারাদিন উপোস করে রয়েছে, বর-বিয়াইকে খাইয়ে তবে নিজে খাবে; ওদিকে মাংস আর মদের সমারোহ চলেছে। চাঁদরা মাদনাপাহাড়ি হতে গাইয়ে নাচিয়ে সাঁওতাল এনেছে···তাদের পেশাদারি নাচ আর দংসিড়িংএর সুর পাহাড়তলির বন ভরিয়ে তুলেছে।

একজনকে সোয়ীর চোখ খুঁজে বেড়ায়···কিন্তু এত লোকের মধ্যেও তাকে দেখা যায় না।

···মদের গন্ধে নৈশ বাতাস ভরে উঠেছে···নাচিয়ে গাইয়ে মাঝি-মেঝেনগুলো বাঁশি আর মাদলের সুরে গেয়ে চলেছে···

হাতে রূপোর বালা দিলম
মাথায় দিলম বুনোহাঁসের পাখা
ও কালো বৌ তবু চাউনি কেনে তুর বাঁকা?
তুর কাজলকালো তারা দুটোন খুঁজে মরে কাহারে?
চল্ যাই চল্ মৌরাঙ্গী পাহাড়ে!

…সোয়ীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের স্বপ্নমুখর কত দিন, ফুকন আর সে…পড়ন্ত রোদের হলদে আভায় পলাশতলার দীঘলছায়ায় বসে স্বপ্ন দেখত সে…বিড়ালের লোমের মত ঘন বনাকীর্ণ ওই মৌরাঙ্গী-পাহাড়ের ওপারের ডুংরীতে তারা বাসা বাঁধবে তুজনে…

…চল্ সোয়ী তুকে লিয়ে চলে যাই উধারে…মৌরাঙ্গীপাহাড়ের উ কোলে, কেউ জানতে লারবেক!

……সুরটা নৈশ অন্ধকার ছাপিয়ে উঠেছে…সোয়ার চোখে জল ছাপিয়ে আসে, মুখ ফিরিয়ে আঁচল দিয়ে চাপতে থাকে।

জনকোলাহল-মুখর ডুংরী হতে ধীরে ধীরে বার হয়ে এলো ছায়ামূর্তিটা… লাঠির ডগায় একটা পুঁটুলি ঝোলানো, আলো-লাগা সরু কুলিপথটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ফাঁকা প্রান্তরে নামল। আবছা চাঁদের আলোয় বন পাহাড় যেন কেমন স্বপ্নমুখর হয়ে উঠেছে। মূর্তিটা কাঁইজোড়ের কালো জল পার হয়ে চলেছে; কল্যাণী মায়ের থানের পাশে, উঁচু রাস্তাটার পানে, কোনদিকে দৃকপাত নাই। এগিয়ে চলেছে সে।

…মূর্তিটা থমকে দাঁড়াল মায়িথানের কাছে বড় রাস্তাটায় উঠে…ঘন জমাট অন্ধকার বাসা বেঁধে রয়েছে ঝাঁকড়া তেতুলবটের নীচে, বটের ঝুরি গুলো নৈশ প্রহরীর মত মাথা তুলে আকাশসই হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে… দূরে পাহাড়তলির বুকে রাতের অন্ধকারে জেগে রয়েছে ডুংরীটা…মাদলের শব্দ আর গানের সুর নৈশ বাতাসে মিশে পাহাড়ের বুকে ধ্বনি প্রতি-ধ্বনি তুলে এগিয়ে আসছে—

…চল্ যাই মৌরাঙ্গী পাহাড়ে…

পিছনে পড়ে রইল তার সব স্বপ্নমুখর দিন…রৌদ্রছায়ার

হাতছানি দেওয়া পাহাড়সীমা···শিশু চাঁদের আলোয় মনভোলান শালমহুয়ার ছায়াতল···

নতুন পৃথিবীর নতুন পথে এগিয়ে চলে মূর্তিটা···। আজ তার যেন সব বন্ধন কেটে গেছে, মহামুক্তির সন্ধানে চলেছে বিরাট বিশ্বে।

···ফুকন রাতের অন্ধকারেই ডুংরী ছেড়ে বার হয়ে পড়ল অজানা পথে।

বর্ষা নামে। পাহাড়ের বুকে শালবনের সীমারেখায় কাজল কালো মেঘের ঘন আবরণ ছেয়ে ফেলেছে বনসীমাকে। ময়ূর ময়ূরীর ডাকে বনভূমি উতরোল হয়ে ওঠে। কন্দরের বুক থেকে পাক দিয়ে পেঁচিয়ে উঠে আসে পাইথন ময়াল সাপের বংশধররা, বৃষ্টির জলধারা বনপাহাড়ি পথে তাদের আস্তানায় প্রবেশ করে গৃহহারা করেছে তাদের। বেউড় বাঁশের ঘন জঙ্গলে পাতার নিচে ঢুকে মুখ বাড়িয়ে বসে থাকে তারা। কুর্চি বনযূঁই কাঠমল্লিকার গন্ধে ভিজে আকাশ স্বপ্নালু হয়ে ওঠে। শাল গাছের নিচে বৃষ্টির জলে ভিজে জন্ম নিয়েছে কাড়ান কুড়কী ছাতু। সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা মাটির ফাটল থেকে বার করে থকা থকা কুড়কী ছাতুগুলোকে। একটা সোঁদা গন্ধে ভরে গিয়েছে বনভূমি। নিচু একটা বাদল-মেঘ নিঃশেষ করে ঢেলে দিল তার সঞ্চিত জলধারা···তৃপ্তির আমেজে শালমহুয়ার লকলকে পাতাগুলো মাথা নাড়ে···তাদের গা বেয়ে জলধারা মাটিতে পড়ছে, টপ্ টপ্ টপ্।

···একা ডুংরীর ঘরে বসে রয়েছে তুরী। আজ বনে যাবার ইচ্ছা তার নাই। সারা মনে তার হাহাকার। এ তার কী সর্বনাশ হলো?

ক্ষণিকের মোহের বশে তার জীবনের এই চরমতম সর্বনাশ কেন সে ডেকে আনল ?

জানাজানি হয়ে গেছে কথাটা সারা মাঝিডুংরীতে। বুড়ো বহা মাঝি মাথা চাপড়াতে থাকে।

বোঙার থানে হত্যে দুব আমি তুরী, এ সব্বোনাশ কেনে করলি ? বুড়ি কুনকী মেঝেন জড়িবুটির হদিশ জানে, তুরীকে অভয় দেয়—দেখ্, বল্ তাহলে, এক শিকড়েই বিবাক ফরসা করে দুব আমি !

শিউরে ওঠে তুরী, তা হয় না। তার গর্ভে আসছে তার সন্তান, তাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে পারবে না, তার পাপের শাস্তি সে-ই ভোগ করবে। একজনকে হত্যা করে নিজেকে বাঁচাতে তুরীর কোথায় যেন বাধে।

···সারা পঞ্চগেরামী সাঁওতাল মুখ টিপে হাসে বহা মাঝিকে দেখে ; বলে, বনদারকে ঘরে রেখেছিলা, এইবার মেয়ের বিহা দাও উর সাথে। লইলে তুমাকে গেয়াঁতে লিতে লারব কিন্তুক।

চুপ করে মাথা নাড়ে বহা মাঝি। সন্ধ্যা নেমে আসে, বৃষ্টি নেমে আসে আকাশ ছেয়ে, রাতের অন্ধকার নেমে আসে জমাট হয়ে···নেমে আসে তুরীর চোখে অশ্রুধারা···বর্ষামুখর রাত সজল হয়ে ওঠে। তুরী বাবার মুখের দিকে চাইতে পারে না।

একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে নিজে ! বুড়ো বগা মাঝি তার কথায় হ্যাঁ না কিছু বলে না।

নতুন শ্বশুর বাড়ি এসেছে সোয়ী। পাহাড়ির ওপারেই বস্তিটা, এপারে ওপারে ব্যবধান মাত্র একটা পাহাড় ; তবু তার মনে হয় কতদূরের পথ ! কাঁইজোড়ের ক্ষীর-ধারা নাই···ফাঁকা মাঠের বুকে গাছ-কোমর করে ছুটতেও এখানে বাধা।

চাঁদ জিজ্ঞাসা করে—কেমন লাগছে তুমার ?

ঘাড় নাড়ে সোয়ী, ভালোই।

চাঁদ সোয়ীকে গড়িয়ে দিয়েছে—গিল্টিকরা নয়, সত্যিকার সোনার গয়না, সাঁওতাল বস্তিতে কখনও যা পরেনা কেউ।

তবু যেন কোথার ফাঁক রয়ে যায়—খুঁজে পায়না সোয়ী।

…সারাদিন কাজকর্মের পর বাড়ি ফেরে…খাওয়াদাওয়ার পর বার হয় ডুংরীতে না হয় বটতলায়। মাচানে বসে বসে গালগল্প করে, নাহয় কোনদিন হাঁড়িয়া খায়। রাত বেড়ে চলে, একা একা সোয়ীর ঘুম আসে না। দূর জঙ্গল হতে ভেসে আসে ফেউএর ডাক…ফেউ…উ…উ! ডাকটা পাহাড়ির এপাশ থেকে দূরে ক্রমশঃ সরে গিয়ে মিলিয়ে যায়।

মনে পড়ে ফুকনকে—আসবার সময় দেখা হয়নি। বুড়ি মেঝেন খবরটা দেয়—ঘরটা ফাঁকা, হাঁ-হাঁ করছে, কুথায় যেন সি চলে গেছে কেউ জানে না।

ফুকনের ঘর সত্যিই ভেঙে গেছে…কি কুক্ষণে সোয়ীর তাকে ভালো লেগেছিল, সেই ভালো লাগার চরম দান দিয়ে গেল ফুকন তার মাটির মায়া ত্যাগ করে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে সোয়ী ভালো করে কাপড় চোপড় ঠিক করে নেয়। মহুয়াফলের তেলের প্রদীপটা জ্বলছে…এগিয়ে আসছে চাঁদ। আজ হাঁড়িয়াটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে! মুখে চোখে একটা পাশব কামনার জ্বালা…ভক্ ভক্ করে গন্ধ ছাড়ছে…বলিষ্ঠ দুটো হাতে সোয়ীকে কাছে টেনে নেয়।

সারা মন সোয়ীর একটা দুর্বার ঘৃণায় ভরে উঠে, চোখ ছাপিয়ে আসে জল। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নাই চাঁদের! লজ্জায় ভয়ে শিউরে ওঠে সোয়ী…চোখ বুজে সে আত্মসমর্পণ করে বাধ্য হয়েই উন্মাদ চাঁদের বলিষ্ঠ

বাহুবন্ধনে! বলে চলেছে চাঁদ কর্কশকণ্ঠে…তু সত্যি ভারি…সোন্দর মাইরি!

সোয়ী কোন কথা বলে না, ইচ্ছে হয় তার গালে ঠাস ঠাস করে গোটা কতক চড় বসিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

…রাত্রির অন্ধকার জমাট বাঁধে আকাশ পাহাড়ের বুকে…দূরে ময়াল সাপের শীষ শোনা যায়…নাগপাশের কঠিন বন্ধনে কোন্ নিরীহ জন্তুকে পিষে মারছে। সোয়ীর সারাদেহেও অমনি কোন ক্রূর সাপের মতই কুটিল প্রাণীর কঠিন বন্ধন, তাকে হয়ত নিঃশেষে মেরে ফেলবে!

চাঁদকে ভালবাসতে কোনদিনই পারে নি সোয়ী। তাই আজ চাঁদকে কাছে পেয়ে, তার অন্তরের পরিচয় পেয়ে ভালবাসা জন্মানোর চেয়ে ঘৃণাটাই বড় হয়ে এলো তার সামনে।

ফুকন নাকি কুথায় চলে গেইছে?

চুপ করে থাকে সোয়ী। ফুকনের পরাজয়ে চাঁদ এত আনন্দিত কেন?

বলে চলেছে চাঁদ,—যাবেক আর কুথাকে? কুন চিনকুঠিতে যেয়ে মালকাটা হয়েছে। ইবার মন করছি আমিও রেজিংএর ঠিকে লুব। সাহেব বুলছিল।

সি আবার কি?

চাঁদ এই ত চায়। নিজের প্রতিপত্তি জাহির করবার জন্যই ব্যস্ত। কত শ' শ' লুক খাটবেক আমার তাঁবে। ইমন কত ফুকনকে খাটাব আমি! জানিস সাহেব একদিন আসবেক তুকে দেখতে।

সি আবার হয় নাকি? সাহেবের কাছে আমি যাব নাই।

হাসতে থাকে চাঁদ। সাহেবদের সাথে উঠা বসা করতে হয় আমাকে, বুঝলি?

রাত্রি কত জানেনা। প্রথম রাত্রি চাঁদের সঙ্গে, তবু ফুকনের কথা বার

বার মনে পড়ে। কোথায় কোন্ চিনকুটিতে কয়লার কালি মেখে সামান্যভাবে দিন কাটাচ্ছে কে জানে! তার ডুংরী ছেড়ে যাবার জন্য সেই দায়ী। ফুকনই বলেছিল—চল্ ইখান থেকে চলে যাই।

কিন্তু যেতে সে পারে নি। তাই চাঁদের শাসনই মেনে চলতে হবে তাকে সারাজীবন ধরে। হঠাৎ চাঁদের কথায় বিস্মিত হয়ে যায়, নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে—ওই, কাঁদছিস কেনে?

কথা কয় না সোয়ী, নীরবে চোখ মুছতে থাকে। আদর করে তাকে কাছে টেনে নেয় চাঁদ। কাঁদতে আছে কখনও?

…সোয়ীর সর্বাঙ্গে চাঁদের নিবিড় স্পর্শ। কেন জানে না শিউরে ওঠে সে কি যেন অজানা আতঙ্কে!

মুখ তোল্!

মুখ ফিরিয়ে নেবার:চেষ্টা করে সোয়ী।

হাসতে থাকে চাঁদ।…ওর চোখেমুখে ডেজির মতই কোমলতা… ডেজির ঠোঁট দুটো…কেমন নরম…হাত খানা! লোলুপ কল্পনা করে সোয়ীর মধ্য দিয়েই আর একজনকে। ডেজি।

…সোয়ীও হারিয়ে ফেলে নিজেকে। বরাকরের নিশীথ বালুবেলায় ফুকনের নিবিড় বাহু-বন্ধনের স্পর্শ…তার তৃষিত ওষ্ঠে কার উষ্ণ পরশ!

দুজনের মনেই চলেছে স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের রোমন্থন ও জল্পনা কল্পনা। কাছাকাছি দুজনে…দুজনে বদ্ধ কঠিন বন্ধনে, যেন একই নদীর দুই তীর। কলছন্দে গান গেয়ে যায়…তবু দুই তীরের গাওয়া কোনদিনই এক সুরে মেলে না, দুজনেই রয়ে যায় দূরে,…বিরহের পার-পরপারে!

রাত্রি নিথর হয়ে আসে, চাঁদের চোখে আসে ঘুম। সোয়ীর চোখে নিদ নাই; কান্না আসে চোখ ঠেলে। ফুকনকে সে-ই নির্বাসিত করেছে, বিনিময়ে মেনে নিয়েছে নিজেরই এই কঠিন জ্বালাময় বন্ধন।

খেতে বসেছে চাঁদ। সোয়ী বলে ওঠে, রেতের বেলায় বড্ড ভয় করে আমার। আজ সোকাল সোকাল আসবা কিন্তুক।

ভয় কিসের রে?

জানিনা। আজ যেতে পাবা নাই কুথাও রেতের বেলায়।

সোয়ী নির্লজ্জের মতই এগিয়ে যায় নিজের মনের জ্বালা থামাবার জন্য, তার সংসারই ভরে তোলবার জন্য,— কিন্তু মাঝে মাঝে চাঁদ আবার সেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে বুনো মোষের মতন। সোয়ীর সব স্বপ্নজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, সমস্ত প্রচেষ্টা পরিণত হয় ব্যর্থ লজ্জার গুরুভারে।

দিন যেতে থাকে। চাঁদের রক্তের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে উচ্ছলতার বীজ! নিস্তব্ধ পরিবেশ, বনসমাকীর্ণ পার্বত্যভূমির হাওয়া তার রক্তে উন্মাদনা আনে। ডুংরীর ফুলী মেঝেনের পরিচয় সবাই জানে···বয়সে চাঁদের চেয়ে বড়ই হবে; তারই ঘরে কাটে চাঁদের অনেক গভীর রাত্রি। সোয়ী জানতেও পারে না···শুধু বিনিদ্র রজনীর প্রহর গোনে সে···ক্লান্ত হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়···মহুয়া তেলের পিদিমটার সলতের বুক পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, চাঁদ তখনও ফেরেনা।

মাঝে মাঝে সুন্দর মাঝি খবর নেয়, চাঁদ আইছে গো?

সোয়ী সাড়া দেয়, না আসে নাই বটে!

গুম হয়ে থাকে সুন্দর। সে কানাকাণিতে শুনেছে সংবাদটা।

সোয়ীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়—সারা মন তার হাহাকার করে ওঠে সেদিনের ঘটনায়।···সকালবেলাতেই একটি মেয়ে শুকনো মুখে এসেছে বহুদূর ডুংরী হতে একা! সুন্দরমাঝি জিজ্ঞেস করে—কি চাই তুমার?

সুন্দর মাঝি দাওয়ায় বসে শণের দড়ি পাকাচ্ছে, মেয়েটা শুকনোমুখে ছলছল চোখে বলে—

বনদার চাঁদমাঝির সঙ্গে আমার কথা আছে।

সুন্দর মাঝি ঘরের মধ্যে ছেলেকে খুঁজতে যায়, কিন্তু দেখতে পায় না। এখুনিই ছিল, মেয়েটাকে আসতে দেখে এইমাত্র পিছন দিয়ে কোথায় বার হয়ে গেছে। ছেলেকে এইভাবে সরে যেতে দেখে একটু সন্দেহও হয় তার। ফিরে এসে বলে মেয়েটিকে, উ ঘরে নাই, আমি উয়ার বাপ বটে, আমাকেই বলতে পারো।

মেয়েটি কোন কথা বলে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ো সুন্দর মাঝি একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে।

সোয়ীও বার হয়ে আসে—মেয়েটিকে বলে ওঠে সে, বনদার আসবেক সেই বেলা গড়িয়ে গেলে ; তুমি তখনই আসবা।

ঢের দূর থেকে আসছি, এইখানেই একটু জিরোবো তাহলে।

সোয়ী তাকে বাড়ির মধ্যেই নিয়ে যায়। তারই বয়সী একটি মেয়ে, দূর পথ হেঁটে এসেছে কি যেন বিশেষ দরকারে। সোয়ীর কথায় মুখ তুলে চায়—নাম কি তুমার ?

তুরী।

কি যেন সন্ধানী দৃষ্টিতে তার দুচোখের দিকে চেয়ে থাকে সোয়ী। মেয়েটা বলে চলেছে, বনদারের বৌ তুমি ?

হ্যাঁ কেনে বল দেখি ?

উত্তর দেয় না তুরী। তার মনে আজ হতাশার হাহাকার, জীবনের পথ তার বেছে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। ডুংরীতে ফেরবার পথ নাই···এখানেও সে ঠাঁই পাবে না। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তার। কোনরকমে নিজেকে সামলাতে থাকে। সোয়ী অবাক হয়ে যায়।

চলে যেতে চায় তুরী, সোয়ীই আটকে রাখে তাকে।

বলতে হবেক তুমাকে, কেনে আইছিলে ?

শুনলে তুমার দুঃখ বাড়বেক বই কমবেক নাই। শুনে কাজ নাই তুমার।

সোয়ীর সারা মনে আজ এক প্রশ্নের আনাগোনা। জোর করে শোনে সে তুরীর কাহিনী।

…ভুল করে সে একদিন সব তুলে ধরেছিল ওই চাঁদের সামনে, চাঁদ লুটে নিয়েছিল তার সর্বস্ব। আজ এই সর্বনাশের দিনে নিজে দূরে সরে গেছে, তুরীর জীবন আজ ব্যর্থ হতে চলেছে। ডুংরী ছেড়ে সমাজ ছেড়ে সে বার হয়েছে অনিশ্চিতের পথে। কোথায় যাবে জানে না।

চুপ করে বসে থাকে সোয়ী…তারও চোখ ছাপিয়ে আসে জল। তুরী নীরবে বার হয়ে গেল। একজনের জীবনে সে আনবে না হতাশা-ব্যর্থতার ছায়া,…নিজের জীবন ত নষ্ট হয়েছেই, সোয়ীর জীবন বিষিয়ে দেবে না।

সুন্দর মাঝি বিস্মিত হয়ে যায়, তুমি চলযেছ যি ?

পরে একদিন আসব আবার। তুরী দ্রুতপদে ডুংরীর বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। না এলেই ছিল তার ভালো, সোয়ীর জীবনের শান্তি সে নিঃশেষ করে দিয়ে গেল। জীবনে সে আর ক্ষমা করতে পারবে না চাঁদকে। মেয়ে হয়ে মেয়েদের এই চরমতম লাঞ্ছনা অপমানের শোধ সে নেবে। পাহাড়ির পথ ধরে মায়িথানের দিকে এগিয়ে চলে। দুচোখ যেদিকে যায় সেই দিকেই যাবে, জানে না তার জন্য অপেক্ষা করছে কী এক নির্মম অদৃষ্টের পরিহাস।

একটা কলিয়ারির পিট থেকে সাক্‌সান পাম্প বসিয়ে জল বার করা হচ্ছে। মোটা পাইপটা দিয়ে হড় হড় করে জল বার হয়ে আসছে…ভট্ ভট্

শব্দে মটরটা চলেছে। একটা গুমটি ঘরে বসে রয়েছে মেকানিক একজন,. এদিক ওদিকে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মাটির খুরি···ছোট পাঁইট বোতল। ঝিম্ মেরে লোকটা বসে রয়েছে শিবনেত্র হয়ে···পরণে তার তেলকালি মাখা প্যাণ্ট···একটা নীল রংয়ের হাফসার্ট। কয়লায় আর ধোঁয়ায় এক নতুন রং ধারণ করেছে সেটা।

একটা উঁচু চড়াইএর নিচে পিটাবটম। বনতুলসীর ঝোপে চারিদিক ঘেরা···নীরব পরিবেশে শব্দটা একটানা গতিতে চলেছে। আরুলাম্বান থমকে দাঁড়াল সেখানে। জলতেষ্টা পেয়েছে···এগিয়ে যায় পাইপটার দিকে। আঁচলা পেতে বসেছে, হঠাৎ পিঠে কার হাত লাগতে চমকে চাইল—

ইয়ে পানি পিনেকে নেহি হ্যায়, ইয়ে লেও।

তার হাতে মেকানিকটা তুলে দেয় একটা বোতল! মাথা নাড়ে আরুলাম্বান—দারু নেহি পীতা হাম।

ক্যা? সরাব নেহি পীতা হ্যায়? আদমি হ্যায় তুম?

লোকটার অট্টহাসিতে ভরে ওঠে নীরব পরিবেশ। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আরুলাম্বান তার দিকে।

চলো হামারা সাথ। পানি তো থোড়াই, দানা ভি মিল যায়েগা।

মেকানিকটা নিয়ে চলে তাকে বনতুলসীর সুঁড়িপথটা ধরে নিচের দিকে। একটা নিমগাছের নিচে কয়েকটা ছোট ছোট ঘর, আরুলাম্বান আশ্রয় পেয়ে যায় সেইখানেই। অভয় দেয় মেকানিক শিউকিষণ, ঠিক হ্যায়, হাত পা আছে তুমার, কাম হামি শিখিয়ে দেবে—**Positive negative fuse wire** আউর **Cutout** ব্যস। কাম হো যায়েগা।

লেখাপড়া কিছু কিছু জানি, ইংরাজী লিখতে পড়তেও পারি।

বেশথ্। শিউরে ওঠে লোকটা!

আরুলাম্বান রয়েই গেল। আজ আর ধর্মযাজকের বেশ তাকে

পরতে হবে না, আজ মানুষের সমাজে সাধারণ একজন মানুষ হিসেবেই সে বাস করবে ওদের সুখদুঃখের ভাগী হয়ে। খাটতে হবে···কোন দুঃখ নাই। নতুন জীবনযাত্রাকে বেশ মানিয়েই নেয় সে। শিউরতনের সঙ্গে সকাল থেকে বার হয়ে যায়; এটা সেটা এগিয়ে দেয়,··· কনেকশান করে···মইএ উঠে তার টানে, রোদে পিঠটা চিড়চিড় করে ওঠে······মাথায় হ্যাটটা চাপিয়ে তারের বাণ্ডিলটা হাতে করে শীষ দিতে দিতে এগিয়ে আসে ধাওড়ার পানে। জনার ক্ষেতের সবুজ পাতায় পিছলে পড়ে রোদের আভা, সাদা চামরের মত জনারের মাথাগুলো বাতাসে দোল খায়···মুক্তির আনন্দে ঝলমল করে ওঠে দিনের আলো।

পরেশনাথ পাহাড়ের চূড়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, নিমগাছের মাথায় রাতের বাতাস স্পর্শ দিয়ে যায়। উনুনের গনগনে আগুনে শিউরতন চাপাটি বানিয়ে চলেছে, আরুলাম্থান বসে থাকে চুপ করে।

দূরে দূরে সাইডিংএ দু'একটা আলো জ্বেলে লোডিং হচ্ছে। আরু-লাম্থানের মনে চিন্তার জাল বোনা।

ক্যা আরুনভাই? ক্যা শোচতা হ্যায়?

কুছ নেহি।

···আগুনের লালচে আভায় শিউরতন দেখতে পায় ওর চোখে মুখে চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে সে—জরু বাচ্চা তুমরা কাঁহা হ্যায়?

দুনিয়ামে কোই হ্যায় নেহি মেরা, স্রেফ একেলা।

আরুলাম্থানের কথায় আজ যেন ক্লান্তির সুর ফুটে বার হয়।

চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত চমকে ওঠে আরুলাম্থান; সুপ্ত তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আবার প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্তস্রোত, বহুদিনের পুরানো জ্বালাটা

আবার দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত সে ফুঁসতে থাকে, এমনি করে নীরবে এদের অত্যাচার সহ্য করবে না।

সেদিন লাইনে কাজ হচ্ছে। হাই টেনসন লাইন ৪৪০ ভোল্ট। কারেণ্ট বন্ধ করে দিয়ে কাজ চলছে, হঠাৎ ওপাশে লালুমাঝি একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। কি যেন একটা সশব্দে উপর হতে পাথরের উপর ছিটকে পড়ল। মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, রক্তে ভিজে যায় শক্ত মাটির বুক। বার কতক খাবি খেয়েই স্থির হয়ে আসে তার দেহ। ছুটে যায় আরুলাম্বান, শিউকিষণ আরও সকলেই। মেইন সুইচটা কে হঠাৎ on করে দিয়েছে। মেইন সুইচ ঘর হতে কাকে বার হয়ে নীচের দিকে চুপি চুপি চলে যেতে দেখেছিল মাত্র একজন, সে আরুলাম্বানই। একমিনিটের ব্যাপার···সুইচ off করাই আছে। অথচ যা ঘটবার ঠিকই ঘটে গেল।

মালকাটা মাঝিরা জমায়েত হয়ে যায়···মঙ্গলা সর্দার বলে ওঠে, হাত ছিটকে গির পড়েছে উ।

বাধা দেয় শিউরতন, কারেণ্টমে গিরা হ্যায়। লাস ডাক্তারী পরীক্ষা করানেকো বোলো।

ছোটসাহেব ম্যানেজার সবাই এসে পড়েছে···লালুমিস্ত্রীর বৌটার কান্নায় সেখানে দাঁড়ান যায় না। ব্যাপারটা ধামাচাপাই পড়ে গেল··· লাস উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে জ্বালানোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে; মালকাটাদের দুখানা দশ টাকার নোট ধরিয়ে দেয় সাহেব, লালুর বৌকে কিছু পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে যায়।···চুপ করে যায় মালকাটার দল।

গুমরাতে থাকে আরুলাম্বান। বহুদিনের ভুলে যাওয়া জ্বালাটা আবার জেগে ওঠে···চোখে তার প্রতিবাদের দীপ্তি। বলে সে—

ইয়ে কভি নেহি বরদাস্ত কর্না !

শিউরতন দাঁড়িয়ে যায়। আরুলাম্থান বলে চলেছে, ছোটসাহেবই দায়ী এর জন্যে, এর বিচার চাই।

কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, ছোটসাহেবের এর আগে লালুমিস্ত্রীর সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল··· তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করেই। একদিন মদের ঝোঁকে ছোটসাহেবকে মারতেও গিয়েছিল লালুমিস্ত্রী। আরুলাম্থান জানে তার কথা মিথ্যা নয়। এর আগেও এমন সে ঘটতে দেখেছে। বাঁশগড়া কলিয়ারির পারমিট ম্যানেজারের মৃতদেহটার কথা মনে পড়ে। গুমরাতে থাকে মনে মনে! প্রতিকারের পথ কী? একটা উত্তেজনা সারা মনকে তার গ্রাস করেছে! ওরা এক জাতেরই,—হেডউড, বাঁশগড়া কলিয়ারির কনর‍্যাড সাহেব···ছোটসাহেব—সব এক মত এক পথেরই লোক।

খা লেও আরুন ভাই! শিউরতনের কথায় চমকে ওঠে সে।

আচ্ছা নেহি লাগ্‌তা ভাই। উঠে পড়ে আরুলাম্থান। মনে তার গরলজ্বালা।

হেডউড সাহেবের চালটা সত্যিই জব্বর চাল। চাঁদ মিশন হোমে প্রায়ই আসে। সাহেবের সঙ্গে বারও হতে হয় তাকে ডুংরীতে ডুংরীতে। প্রচারকার্য করে সাহেব, চাঁদ তার তল্পিদার—বিনিময়ে চাঁদ পায় ঠিকেদারী কাজ আর ডেজির সঙ্গে গল্পের সুযোগ।

ডেজির মনে এসব রেখাপাত করেনা। এই তাদের পেশা, এর আগে সাঁওতালপরগণার মিশন হোমে এরই জন্য রাখা হয়েছিল তাকে। তিন চার জন সর্দারের ছেলেকে ইতিমধ্যে গির্জার পোষাকও পরিয়ে ফেলেছে, এবারের শিকার চাঁদ।

মুখস্থ করা বুলি—অভ্যস্ত চটুল চাহনিতে হেসে চাঁদের গায়ে ঢলে পড়ে —**I love you Chand !**

চাঁদের চোখে নেশা, কোথা লাগে সোয়ী এর কাছে! এমনি হাসির ধার সোয়ীর কোনদিনই আসবে না।

একদিন চলনা বেড়িয়ে আসি ডেজী !

এত সহজে ধরা দিতে চায় না, রহস্য ভেঙে যাবে। চোখ নাচিয়ে বলে ওঠে ডেজি, **Naughty b›y !**

কোন্‌দিকে যে বেলা চলে যায় ঠিক থাকে না। আজকের মত বার হয়ে যায় চাঁদ।

মিঃ হেডউডের অফিসে এসে পৌঁছেছে তুরী অনন্যউপায় হয়ে! মাঝি সমাজে রং ভালবাসার ততখানি বিধিনিষেধ নাই বটে, কিন্তু কোন জারজসন্তানকে তাদের সমাজ ঠাঁই দেয়না। তুরীরও তাই আর ফিরে যাবার ঠাঁই নাই। প্রয়োজন হলে অন্য ধর্মই মেনে নেবে, তাই মরীয়া হয়েই এসেছে আশ্রয়ের জন্য এইখানে। মিঃ হেডউড কিন্তু এসব মহা উপকার করতে আসেনি, বলে ওঠে—

হোবে না ইসব, হোবে না। নিকাল যাও। নিকাল যাও হিঁয়াসে।

ব্যাকুল কণ্ঠে বলে চলে তুরী, তুমাদের ধম্মো নিলে বাঁচাবে সাহেব ? তাই রাজি আছি !

What nonsense ! Get out, I say get out from here.

সাহেবের চীৎকারে এবং তার নীলচোখের দীপ্ত আভা দেখে অপমানিত হতাশ হয়েই বার হয়ে আসে তুরী। চরম ত্যাগ স্বীকার করেও যখন মানুষ তার কোন প্রতিদান পায় না—সে মরীয়াই হয়ে ওঠে।

তুরীও তাই বার হয়ে এল দাঁতে দাঁত চেপে।

কোনরকমে এখান থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে। সে যে

এতবড় নীচ কাজ করতে এসেছিল এ যেন কারুর চোখে না পড়ে। এর চেয়ে বরাকরের জলে ডুবে মরা ভালো, বাঘ সাপের হাতে মরাও পৌরুষের।

জ্বালাময়ী আগ্নেয়গিরির মতই এগিয়ে আসছে সে, হঠাৎ রাস্তার বাঁকেই একজনকে দেখে চমকে ওঠে। বিশ্বাস করতে পারে না তার চোখকে। এই অপমান—এই জ্বালায় জ্বলে মরল একা তুরী, আর সেই বনদার আজ পরম সুখে ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘরসংসার জাঁকিয়ে বসেছে। একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে—চিনতে পারো ?

থমকে ঘোড়া দাঁড় করালো চাঁদ—তুই !

হাঁ। কি দোষ করেছিলাম তুমার কাছে, কেনে আমার এই সব্বোনাশ করলে ?

পথ ছাড়্ !

গর্জে ওঠে তুরী—ছেড়ে তুকে আমি দুব, কিন্তু বোঙা ছাড়বেক নাই —আজও সুরয বংহা আছে—লদীর জল বয়, আত দিন হয়—তারা দেখবেক। ইয়ার বিচার করবেক।

পকেট হাতড়ে কয়েকটা টাকা ছিল তাই বার করে দিতে যায় তুরীর দিকে—এই লে, ইদিকে আর আসিস না।

ঘৃণায় শিউরে ওঠে তুরী। টাকাগুলো দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয় তার দিকে—টাকা! অনেক টাকা হইছে তুর, না ? মাঝির ঘরের কুকুর তুই ! সরম নাই ?

যাবি না ?

এগিয়ে আসে তুরী, জ্বালায় ফেটে পড়ে সে। চোখ দিয়ে বার হযে আসে অশ্রুরাশি—মেরে ফেল্, মেরে ফেল্ তু আমাকে! ই জ্বালা আর সইতে লারি। কালা মুখ লিয়ে আর বাঁচতে সাধ নাই। মেরে ফেল্ তু।

টাকাগুলো কুড়িয়ে তার হাতে তুলে দিতে যাবে মাটিতে নেমে চাঁদ, পিছিয়ে যায় তুরী…ছুঁস্‌না, ছুঁস্‌না আমাকে। চোখের সামনে থেকে হুরুকে যা !

তু ইদিকে আর আসিস না। আরও কিছু টাকা দুব তুকে ?

চমকে পিছিয়ে আসে চাঁদ।

থুঃ থুঃ… তুরী যেন উন্মাদ হয়ে গেছে ! চাঁদের মুখে একচাপ থুথু দিয়ে হাসতে থাকে। ঘৃণায় যেন রিরি করছে ওর গা—এত ডর তুর ! যা—তুর কুন অনিষ্ট আমি করব নাই। তুর জন্যে লয়, তুর বৌটোর দিকে চেয়েই। আমি জ্বলছি, সে আবার কেনে জ্বলে !

মাথা নিচু করে মুখের থুথুগুলো মুছতে মুছতে ঘোড়ায় উঠল আবার চাঁদ। তুরী এগিয়ে চলে কলিয়ারিগুলোর দিকে। বেলা পড়ে আসছে। দূরদিগন্তের মাথায় কাঁচা কয়লা পোড়ানোর ধোঁয়া জমাট বেঁধে রয়েছে আকাশের গায়…তুরী এগিয়ে গেল ওই ধূমাচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে। চাঁদের ঘোড়াটা চলছে বনানীর প্রান্তে নির্ধূম নীল আকাশের নীচে পর্বত—সানুদেশের পানে। সূর্যাস্তের রঙে রাঙা হয়ে গেছে পাহাড়ের মাথা, আকাশের বুক।

সোয়ী চাঁদকে আজ কোনমতেই ক্ষমা করতে পারে না। ওর পাশব প্রবৃত্তিভরা চাহনি, মদ্যপ স্বভাব সবকিছুই তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে, তুরীর জীবনের দুঃখময় কাহিনীর কথা কোনমতেই ভুলতে পারে না। দয়া করে তুরী তার জীবন থেকে সরে গেল। নাম না জানা একটা মেয়ের অন্তরের যে পরিচয় সে পেয়েছে তার তুলনায় চাঁদের পশুত্বকে আজ সে পঙ্কিল নরককুণ্ডের মতই বিবেচনা করে। গুম হয়ে বসে থাকে, বুড়ি মেঝেন ডাক দেয়—খাবি না বৌ, এই ?

উঁহু, শরীলটা ভালো লাগছে নাই।

খাবার ইচ্ছা তার বিলুপ্ত হয়ে গেছে মন থেকে, জেগে রয়েছে একটা বুকজোড়া বিতৃষ্ণা,—চাঁদের উপর, এখানকার মাটির উপর। কেন তাকে এনেছিল সে? তুরীকে বিয়ে করলেই তো সব দিক থাকত—ওর জীবন এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যেত না।

চাঁদের মেজাজটা আজ ভালো নাই। কদিন থেকেই একটা অর্ডারের চেষ্টায় ঘুরছিল, পারমিট ম্যানেজারকে নগদ কিছু দিয়েও এসেছিল সুপারিশ করবার জন্য, আজ সেখানে গিয়ে শোনে···অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে এবং সাতদিনের মধ্যেই মালও এসে পড়বে। বেশ খানিকটা গরম মেজাজেই সে বাড়ি ফিরেছে।

সোয়ী বলল, তুরী আইছিল।

চমকে ওঠে চাঁদ। বলে, সি আবার কে?

চিন না তাকে? সিবার বন কাটাতে গিয়ে থেকে আইচ তাদের ঘরে···সব্বোনাশ করে আইছ তার···তাকে চিনলা না?

গর্জন করে ওঠে চাঁদ,—খবরদার! রা কাড়বি না!

ডরাই থাকবো নাকি? কেনে তাকে বিহা করলা নাই, আজ আর মরা ছাড়া তার কি পথ আছে বল?

কেনে?

ন্যাকা, কিছুই জানো না?

সোয়ীর বিদ্রূপভরা কণ্ঠস্বরে জ্বলে ওঠে চাঁদ। এগিয়ে যায় তার দিকে, গর্জন করে বলে—

করেছি, বেশ করেছি। আমার যা ইচ্ছে করবো। ফের তু যদি ইতে রা কাড়তে আসিস···টুটিতে পা দিয়ে বিবাক শ্বাস করে দুব, হ্যাঁ!

সোয়ী আজ মরীয়া ওঠে উঠেছে। একটা হেস্তনেস্ত করতে চায় সে, ঢের হয়েছে তার জীবনে সুখভোগ। বুক চিতিয়ে এগিয়ে আসে—

না কর তবে বোঙার দিব্যি থাকে !

কোন্‌দিকে কি হয়ে গেল বুঝতে পারে না সোয়ী, একটা আর্তনাদ করে ওঠে,···চোখের সামনে সব ঘুরপাক খেতে থাকে—পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে তার, একটা কি যেন দলা পাকিয়ে আসে গলার কাছে···দমবন্ধ হয়ে আসে। ছিটকে পড়ে তার জ্ঞানহীন দেহটা দাওয়ার নিচে··· একটা কালো পাথরে লেগে কপালটা খানিকটা কেটে যায়, শক্ত মাটির বুক ভিজে যায় রক্তের ধারায়। দাঁড়িয়ে ফুলছে চাঁদ।

গোলমাল শুনে ছুটে আসে বুড়ি মেঝেন···সুন্দর মাঝি। ধরাধরি করে সোয়াকে তুলে মুখে চোখে জল দিয়ে বাতাস করতে থাকে। খানিকক্ষণ পর চোখ মেলে সোয়ী।

সুন্দরমাঝি ব্যাপারটা শুনেছিল সবই, সকালে মেয়েটিকেও আসতে দেখেছিল। আজ সেও চাঁদকে ক্ষমা করতে পারে না।

সোয়ীর সব যেন্‌ হারিয়ে গেল একমুহূর্তের মধ্যেই। পরাজয়ের বেদনায় তার চোখে আসে জলধারা, ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে। সুন্দরমাঝি গুম হয়ে বসে থাকে। সোয়ীর জন্য আজ তারও দুঃখ হয়।

রাঙামাঝির কানে আসে ব্যাপারটা। সোয়ীর গায়ে হাত তুলতে সাহস করবে চাঁদ এটা ভাবতেই পারেনি। আজ বুড়ো চমকে ওঠে···চাঁদের দুটো পয়সা হয়েছে, তাই সে তার আদরের মেয়েকে এমনি করে অপমান করতে সাহস করে। বুড়োর আজ মনে হয়, এর চেয়ে কোন গরীবের ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার নিজের ঘরে রাখলে বোধহয় সুখী হতে পারত সোয়ী, জমিজিরাত নিয়ে সাধারণ মাঝি গুঁরাওদের জীবনযাত্রায় সে শান্তি পেত। আজ আর ভেবে কোন লাভ নাই।

সোয়ী বাবাকে আসতে দেখে এগিয়ে যায়। কেমন আছিস তু ?

সোয়ী কথা কয়না, কিন্তু বুড়োর নীলাভ চোখদুটোর সন্ধানী দৃষ্টি মেয়ের মনের খবর জানতে পারে। বুড়ো মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে থাকে।

দিনকতক ফুলডুংরীতে যাবি তু ?

তাই লিয়ে চলো বাবা, ইখানে আমার মন টিকছে নাই।

সুন্দর মাঝিও বাধা দেয়না। সোয়ী আসবার সময় চাঁদের সঙ্গে দেখা করেও আসেনা, বেতের তোরঙ্গটা মাথায় নিয়ে বুড়ো রাঙামাঝির পিছু পিছু পথ ধরে। মনটা যেন হাল্‌কা হয়ে আসে খানিকটা। পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে তারা উঠছে···নীচে দেখা যায়, তাদের ডুংরীর বিশাল ছায়াঘেরা কেঁদ গাছটা ঘন কালো পাতার সমারোহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাঁইজোড়ের জলধারা বয়ে চলেছে সমানে, হলদে রোদ বাসকবনের বুকে লুটোলুটি করে···একঝাঁক চড়াই পাখি তাদের পায়ের শব্দে কিচমিচ করে উড়ে যায়। সোয়ী আবার যেন হারানো দিনগুলো ফিরে পেয়েছে।

কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে আরুলাস্থান আজ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে চিনতে পারে। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ভ্রাম্যমান জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে চিনেছে তার আশেপাশের মানুষকে···জেনেছে তাদের দুঃখ বেদনা দারিদ্র্যের ইতিহাস···দেখে এসেছে কালো মানুষের উপর সাদা মানুষের অকথ্য অত্যাচার। আজ সে পথ খুঁজে ফেরে। কতকগুলো বই···মিশনারি ফাদার ক্রমফিণ্ডের একটা ছবি টাঙান, সেই তাকে ইংরাজী ভাষা শিখিয়েছে···যার জন্য কলিয়ারি কারখানায় এই সম্মান··· সেই জ্ঞানটুকুর জোরেই সে জেনেছে, অনুভব করেছে এদের চেয়ে অনেক

।

রাত্রি হয়ে আসে ; নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকার ভেদ করে কানে আসে স্টীম বয়লারের ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্ শব্দ। একটা মোমবাতি জ্বেলে সে পড়ে চলেছে বীরসামুণ্ডার ইতিহাস।

রাঁচি জেলার আদি জাতি মুণ্ডাদের সর্দার একটি যুবক, সে শুনেছিল পাহাড়ের মধ্যে দেবতার কণ্ঠস্বর···সে এসেছে এদেশে এদের অত্যাচারীর হাত হতে রক্ষা করতে।

ভগবানের দূত···দেহে মনে এই অসীম প্রেরণা নিয়ে সে ডুংরী হতে ডুংরীতে বনেবনান্তরে শুনিয়ে বেড়ায় দরিদ্র মানুষকে এই প্রতিবাদের ভাষা ···ইংরেজ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে! বছরের পর বছর বীরসা মুণ্ডা চালিয়ে যায় এই স্বাধীনতার সংগ্রাম···তাদের দেশ, তাদের অন্ন বিদেশীকে ছিনিয়ে নিতে দেবে না। বহু রক্তপাতের পর একজন মুণ্ডাই বিদেশীর অর্থলালসায় ধরিয়ে দেয় এই বীরসাকে।

রাঁচি জেলে বিচারের প্রহসনের পর বীরসাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।···

রাত্রি ঘনিয়ে আসে, আরুলাম্বানের চোখের সামনে ভেসে ওঠে কনর‍্যাড—হেডউড, ওই ছোট সাহেবের মুখগুলো···ওদেরই দল বীরসাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল নিজেদের শাসন কায়েম রাখবার জন্য···

History of the Santhal Revolution···

ডুমকা জেলা···রামপুরহাট সীমান্ত···আজও সেখানকার লালমাটি পাহাড়ের গা হতে তার জাতভাইএর রক্তের ধারা মুছে যায়নি। বন্দুকের গুলির ধোঁয়া আজও সেখানকার বাতাসে মিশে রয়েছে। কঠিন হাতে পাশব শক্তি দিয়ে এরা দমন করেছিল তাদের। ওদের কল চালাবার, কলিয়ারি অঞ্চলে পাথর কেটে কয়লা তোলবার লোক চাই, তাই তামাম একটা জাতকে জানোয়ার বানিয়ে রেখেছিল সমস্ত পশুশক্তি দিয়ে। দীর্ঘদিনের অত্যাচার মাঝিদের রক্তে এনেছে অমানুষের পরিচয়।

এমনি করে একটা সমস্ত জাতকে গ্রাস করে ফেলার নজির কোনদেশের ইতিহাসে পায়না আরুলাম্থান।

রাত্রি কত জানেনা···মোমবাতিটা নিঃশেষ হয়ে আসছে, নীচে জমা হয়েছে গলে পড়া মোমের টুকরো···একটা দমকা বাতাসে নিভে গেল সলতেটা, সব অন্ধকার···থমথম করছে রাত্রি। আকাশের মাথায় অসংখ্য তারকার জ্যোতি, ছায়াপথের পরিক্রমা। মনে হয় তার ওই জ্যোতিষ্কের মহামণ্ডলের মতই পৃথিবীর অগণিত মানুষ-সমাজের সেও একজন। দিনের আলোয় কোন দীপ্তি নাই ওদের। দুঃখের তমসাচ্ছন্ন রাত্রে সমষ্টিগত হয়ে তারাও জ্বলতে পারে নেবিউলার মত ক্ষীণ আভায়; যতই ক্ষীণ হোক তবু সেই আভা হবে স্নিগ্ধ শান্ত···নয়নরঞ্জক।

রাত্রি বাড়ে···দূরে কলিয়ারি অফিসের পেটা ঘড়িতে বাজে দুটো।

ফুকন ডুংরী ছেড়ে এসে অবধি ঠিক বুঝতে পারে না কাজটা সে খারাপ করেছে কিনা। সোয়ী চলে গেল অন্যজায়গায়, একটা মেয়ের জন্য সে কেন নিজের দেশ মাটি ছেড়ে চলে আসবে? এই চিন্তা তার সারা মনকে ব্যাকুল করে তোলে। বনসীমা তাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সকালবেলাতে বাঁশগড়া কলিয়ারির গেটের সামনে অনেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে, রোজকার কাজের জন্য মজুর দরকার। ফুকন দাঁড়িয়ে আছে। একটা বুড়ো মাঝি আধপোড়া বিড়ি টানছিল···বার বার তার দিকে চেয়ে থাকে, লোতুন আইছ নাকি হে?

হাঁ।

গায়ের পিরানটো খুলে দাঁড়াও হে; ছাতি আছে তুমার, টপ্ করে লিয়ে লেবে। আমাদের মত চিম্‌সে মেরে যাওনি এখনও।

ফুকন কথাগুলো শোনে মাত্র, কোন জবাব দেয় না। দেহ দেখিয়ে এমনি করে চাকরি নিতে তার যেন কোথায় আত্মসম্মানে লাগে।

হঠাৎ একটা হৈ চৈ পড়ে যায় সকলের মধ্যে। লাইন দেখতে দেখতে সাহেব এগিয়ে আসছে। ছু'একজনকে নিয়ে ওপাশে দাঁড় করিয়ে রাখল, ফুকনের কাছে এসে আপাদমস্তক তাকে দেখে এপাশে যেতে বলে। পাশের শুঁটকো লোকটা বলে ওঠে—ফিকির বাৎলে দিলাম হে, বিড়ি খেতে ছুটো পয়সা দিতে হবেক কিন্তুক।

জীবনে এই প্রথম কাজ করছে ফুকন, ডুলিতে করে নেমে চলেছে পাতালপুরীর দিকে সোঁ সোঁ শব্দে। ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে চারিদিকে, কাছের মানুষকেও দেখা যায় না। দিনের আলো-হাওয়া মুছে গেছে নিঃশেষে। হাঁফ লাগে তার, দম নিতে কষ্ট বোধ হয়। খটাং করে একটা শব্দ হতেই থেমে যায় ডুলিটা, নীচে এসে পৌছেছে তারা। নামল ফুকন। উপরের দিকে চোখ মেলবার চেষ্টা করল—একটা সিকির মত কি যেন চক চক করছে বহু দূরে, ওই রন্ধ্রমুখ দিয়ে সে নেমে এসেছে!

কেরাসিনের কুপির আলোতে এগিয়ে চলে সুড়ঙ্গ বয়ে। গুর্-গুর্ শব্দে মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে পাতালপুরীর অন্ধি-সন্ধি। কয়লা কাটাই হচ্ছে, গান্-পাওডার চার্জ করে জমাট কয়লার চাপ ফাটিয়ে দিয়ে ওরা কয়লা তুলছে।

গাঁইতি ধরে ওদের সঙ্গে ফুকনও কোপ মারতে থাকে, তাল তাল কয়লা খসে পড়ে···টিবিং ওয়াগনগুলো বোঝাই করে ঠেলে নিয়ে যায় মেয়েরা।

এত কুৎসিত মেয়ে ফুকন দেখেনি কোথাও। কয়লার ধূলোতে সারা মুখ-হাত ভরে গেছে, চোখের কোলে জমেছে কালো জমাট আস্তরণ। হাসলে সাদা দাঁতগুলো আকর্ণ বেরিয়ে পড়ে। মেয়েটা তার দিকেই

এগিয়ে এসে হাতের ফাঁক হতে বার করে এগিয়ে দেয় দুখানা রুটি—লে, খা।

না।

হেসে ফেলে মেয়েটা। সরে আসে ফুকন, আর একটু হলে তার গায়েই ঢলে পড়ত আর কি !

—লাগর লোতুন আইছ কিনা, তারপর এই গিরিমেঝেনের পিছুতেই ঘুরতে হবেক হে ! ইখানের সবাই আমাকে চেনে।

কথা কয়না ফুকন। মেয়েটা এগিয়ে এসে ফুকনের হাতখানা চেপে ধরে—রাগ হইছ ? হুঁ, লইলে 'রা' কাড়ছ নাই কেনে হে ?

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যায় ফুকন। তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত হাসিটা ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে কলিয়ারির সুড়ঙ্গের মধ্যে।

কাজ শেষ হবার পর উপরে উঠে আসে ফুকন। দিনের রোদ মুছে গেছে, জমাট ধোঁয়ার আস্তরণ বাসা বেধেছে চড়াইএর নীচে ; ধূলো আর শরতের কুয়াশা ধোঁয়ার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে গ্রাস করতে আসছে সমস্ত উপত্যকাটা। ঝুড়ি-গাঁইতি নিয়ে দলে দলে লোক উঠে আসছে··· দেখলে চেনা যায় না। ফুকনও যেন চিনতে পারে না নিজেকে। নখ দিয়ে আঁচড় কাটলে গা হতে ময়লা উঠে আসে একপুরু।

সামনে সাপ দেখলে চমকে ওঠার মত ভাবটা হয় ফুকনের সেই গিরি মেঝেনকে দেখে। মেয়েদের মধ্যিখানে সে-ই যেন মধ্যমণি। হাত পা নেড়ে গান গাইতে গাইতে বনতুলসীর ঝোপ দিয়ে চলেছে ধাওড়ার দিকে। কুলি সর্দারটাও হাসে। ওভারম্যানের নাকটা একবার নাড়া দিয়ে এককলি গান শুনিয়ে দিয়ে চলে যায় গিরিমেঝেন।

ফুকন তার প্রতিপত্তি দেখে একটু চমকে ওঠে।

কাজের ঘোরে এতক্ষণ সব ভুলে ছিল, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে ধাওড়ায় ফিরে বার বার ডুংরীর কথা মনে পড়ে। কার উপর অভিমান করে

চলে এলো সে এই পঙ্কিল জীবনে! রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে উন্মত্ত কোলাহল, হাঁড়িয়া আর শুঁটকি মাছ পোড়ার তীব্র গন্ধ। একটা মেয়ের চীৎকার, বেদম পিটিয়ে চলেছে মাঝিটা মদ খেয়ে তার মেঝেনকে। ওপাশ হতে ভেসে আসে বেসুরো গানের শব্দ—

সবার বিহা হয়ে গেল

আমার বিহা হোলো নাই লো ও লো!

চিড়ে চিবিয়ে পড়ে রয়েছে ফুফন, রাঁধতে ইচ্ছা হয় না, আয়োজনও নাই। হঠাৎ কাকে আসতে দেখে উঠে বসে।

গিরিমেঝেন এসেছে, হাতে তার একটা সান্‌কিতে ভাত আর কি একটা চচ্চড়ির মত।

কেনে লিয়ে এলা ইসব? আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

ওই, শরীল থাকবেক কেনে হে! বৌএর সাথে ঝগড়া করে আইছ?

না, বিহা আমার হয় নাই।

তবে রাগটা হইছে কার উপর বল দিকি?

চুপ করে থাকে ফুকন। এগিয়ে আসে গিরি,

বুঝেছি! কারুর সাথে রং ধরেছিল তুমার মনে, সি চলে গেইছে তুমিও চলে আইছ।

বলে ওঠে ফুকন—যাবা তুমি ইথান থেকে?

যাবো না তো কি তুমার সাথে মস্‌করা করতে আইছি? খেয়ে লাও, আমি চলে যেছি।

হঠাৎ একটা মত্তপ কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে ফুকন। ওভ্যারমানটা মত্ত অবস্থায় আসছে, পা দুটো টলছে তার। চীৎকার করে।

এ্যাই গিরি—আয় বলছি, শীগগির আয়। এ্যাই…

এগিয়ে যায় গিরি, তার কাংস্য-নিন্দিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

হারামজাদা মিন্‌সে কুথাকার, ফের আইছিস তুই, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দুব এইবার। ভাত দিবার ভাতার লয় কিল মারবার গোঁসাই! পয়সা নাই কড়ি নাই—লাগর আইচেন! দূর হ মুখপোড়া কুথাকার!

পয়সা! পয়সা কি? লোট লিয়ে আসব তুর জন্যে! দেখ কেনে বৌটা দিবেক নাই! মাইরি দেখ, কেড়ে লিয়ে আসছি।

লোকটা টলতে টলতে চলে গেল, বোধহয় ঘরে গিয়ে বৌটাকেই প্রহার শুরু করবে এইবার।

ফুকন বিস্মিত হয়ে যায় গিরির কথা শুনে; এগিয়ে আসে গিরি—

ই নরককুণ্ড হতে চলে যাও তুমি, যিখানে ছিলা সিখানকেই ফিরে যাও; ইখানে থাকলে মরে যাবা—ঠোর মরে যাবা তুমি। আমিও ইমন ছিলাম না, পাকে পড়ে আজ ই দশা হইছে। যাবা তুমি?

ফুকন বিস্মিত না হয়ে পারে না। এই ক'দিনের দেখা দুনিয়াকে যা চিনেছে সে তাতে মন বিষিয়ে গিয়েছিল তার। চারিদিকে পঙ্কিল পরিবেশ, এই বেশ্যা গিরিমেঝেন সেও টের পেয়েছে তার অপমৃত্যুর, কিন্তু নাগপাশ হতে মুক্তির পথ তার নাই। তাই ব্যাকুল অনুনয় তার ফুকনের অন্তর স্পর্শ করে। তার দেওয়া অন্ন গ্রহণ করতে আর বাধে না।

কথা দেয় তাকে, সে চলেই যাবে এখান থেকে। এখানকার জীব হতে সে চায় না, এর চেয়ে পাহাড়তলীর ডুংরী তার কাছে অনেক মধুময়—অনেক শান্তিপূর্ণ স্থান।

বাকি রাতটুকু কাটিয়েই সে পা বাড়াবে। আজ প্রায় চার মাস এখানে ওখানে কাটিয়ে, ভেবেছিল এই আশ্রয়ে এসে কিছুদিন নিশ্চিন্ত হতে পারবে। কিন্তু ভালোই হলো তার। ডুংরীর এক কোণে পড়ে থাকবে, দিনান্ত পরিশ্রমে তার একার জীবন বেশ কেটে যাবে। কোন আশা

নাই আকাঙ্ক্ষা নাই ; নীল পাহাড়ের গায়ে বনসীমার বুকে বাতাসের মত হালকা ছন্দে কেটে যাবে তার দিন।

থালাটা নিয়ে চলে গেল গিরিমেঝেন। এক শুয়ে শুয়ে ভাবছে ফুকন।

রাঙামাঝির ঘর আবার সোয়ীর পায়ের ছাপে ভরে ওঠে। কিন্তু কোথায় যেন একটা পরিবর্তন এসেছে তাদের। সোয়ী আর সে চঞ্চল প্রাণসম্পদভরা মেয়েটি নাই···রাঙার বয়সও যেন বেড়ে গেছে এই কটা মাসের মধ্যেই।

এখানে সোয়ীর আসার পর চাঁদের কোন খবরই নেয় নি। সোয়ী যেন নিশ্চিন্তই হয়ে রয়েছে···কিন্তু রাঙামাঝির কাছে এই নীরবতা ভালো লাগে না। কে জানে এর ফলে সোয়ীর জীবনে কী পরিবর্তন আসবে। মাঝে মাঝে কথা পাড়বার চেষ্টা করে—আজ সুন্দরমাঝি ইদিকে আইছিল, খপর লিয়ে গেল। চাঁদের নাকি শরীলটা ভালো নাই।

সোয়ী মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিস্পৃহকণ্ঠে বলে ওঠে—গাইটার দুধ কিন্তু কমে আসছে বাবা, চাট্টি খোলছানি দিতে হবেক উকে ইবার থেকে।

হুঁ। কথাটা ফেরাতে চায় সোয়ী, এটা অজানা নয় রাঙামাঝির কাছে। বেশী কিছু বলে না সে।

হিমেল হাওয়া পড়েছে ডুংরীর আকাশে পাহাড়ে। শীত একটু আগেই জানান দেয় এ মুলুকে। শাল মহুয়ার পাতা হল্‌দে হয়ে এসেছে ঝরে পড়ার সঙ্কেত নিয়ে, রিক্ত বাতাস সারা দেহে শিহর নিয়ে আসে। কাঁইজোড়ের ক্ষীরধারা আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে···পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট চাঁদামাছের দল খেলে বেড়ায়, লক্‌দিশাল, টিকরলাদি ধান পেকে উঠেছে দুধারে, গমের ক্ষেতের সত্যকর্ষিত মাটির বুক থেকে

বাতাসে ভেসে ওঠে একটু সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। রাঙামাঝি কাস্তে হাতে করে চলেছে জোড়ের ধারে। পাহাড়ীর নীচেই লকলকে ঘাসগুলো দোল খায় বাতাসে, ঝাঁকড়া একটা কেঁদ গাছের নীচে আওতা পেয়ে জন্মেছে কচি ঘাসের বন। ওদিকে বড় একটা কেউ যায় না···রাঙামাঝি কাপড়খানা হাঁটুর উপর তুলে···মুঠো করে ঘাসগুলো ধরে ডান হাতে কাস্তে চালাতে থাকে। ধারাল কাস্তের ফলাটা রোদে চিকচিক করে ওঠে···তীব্র গতিতে নিপুণ হাতে কেটে চলেছে শিশির-ভেজা ঘাসগুলো।···

···স্···স্···সস্, একটা কিসের যেন তীব্র শব্দ। এগিয়ে আসছে জানোয়ারটা তীব্র মসৃণ গতিতে। রোদের আভায় কালো দেহের উপর চক্রাকার সাদা মেটে ফোঁটাগুলো ঝিকমিক করে···ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো পলকহীন হয়ে গেছে তার···মাঝে মাঝে সর খাগড়ার ফাঁকে ধারাল দ্বিধাবিভক্ত জিবটা লকলক করে ওঠে।

কিসের একটা কঠিন চাপ অনুভব করেই ফিরে চায় রাঙামাঝি, কসে বসে গেছে বাঁধনটা তার দুটো পা আর কোমরে, প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে বুড়ো, পায়ের হাড়খানা বোধ হয় ভেঙেই যাবে! পেঁচিয়ে বসছে শক্ত বাঁধন, লেজের সাপটে মাটিতে পড়ে গেল বুড়ো— সাপটা বুকের উপর আর একটা পাক জড়িয়ে ফেলে···দম বন্ধ হয়ে আসছে, বুক পিট সেঁটে ধরেছে তার, পাঁজরাখানা এইবার ভেঙে যাবে প্রবল চাপে। প্রাণপণে কাস্তেখানা সাপটার গায়ে লাগিয়ে কাটবার চেষ্টা করে। ক্রুদ্ধ গর্জনে ভরে যায় জায়গাটা। চোট খেয়ে সাপটাও যেন উন্মাদ হয়ে যায়, সর্পিল গতিতে পাকগুলো আরো নিবিড় করে তোলে। একটা ঝাপটায় রাঙা ছিটকে পড়ে বদ্ধ অবস্থায়, হাতের কাস্তেখানা পড়ে যায় দূরে। একটা চাপা গোঙানির শব্দ ময়ালসাপের ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে মিশে সারা আকাশ ভরিয়ে তোলে ; ঘাসবনের মধ্যে চলেছে প্রবল

আলোড়ন। বাগাল রাখালগুলো ছুটে আসে, মাঝে মাঝে গরু বাছুরকে এইভাবে ধরে ফেলে ময়াল সাপগুলো—ঘুপটি মেরে পড়ে থাকে···একলা পেলেই এসে পেঁচিয়ে শেষ করে দেয়।

···কলরব করে তারা ছুটে আসে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। লোকটাকে চেনা যায় না, উপুড় হয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে, সাপটা তাকে পেঁচিয়ে দুমড়ে দিয়েছে, কঠিন চাপে হাড়মাংস ফেটে গেছে।

ডুংরীর লোকজন ছুটে আসে···বল্লম-বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে সাপটাকে শেষ করবার চেষ্টা করে। সবুজ ঘাসের বন রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়; সাপটা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ে যায়। ওপাশে পড়ে রয়েছে রাঙা সর্দারের তালগোল পাকান দেহটা, চাপ চাপ রক্তের দাগ জমাট বেঁধে রয়েছে।

সোয়ী বিশ্বাসই করতে পারে না তার এই সর্বনাশের কথা। গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, মিঠে রোদ ফিকে হয়ে লেগে রয়েছে কেঁদ পাতার বুকে। ঘাসের বনে ছড়ান রক্তের দাগ, তালগোল পাকান বিকৃত দেহটা পড়ে রয়েছে ওপাশে। চারিদিক নীরব নিস্পন্দ, মাঝে মাঝে চাতকপাখির ডাক দূর আকাশসীমায় ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে যায়।

—ফটিক···জল······শান্ত পরিবেশে ওর ব্যাকুল শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায়। সবকিছু যেন স্বপ্ন; শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সোয়ী।

তার বাবা যেন কোথায় চলে গেছে, কবে আসবে তা ঠিক বলে যায় নি তাকে।

কাঁইজোড়ের ধারে চিতাটা জ্বলছে। সোয়ী এতক্ষণে বুঝতে পারে কী সর্বনাশ তার হয়ে গেল। চিতার আগুনে ভস্মসাৎ হয়ে গেল তার মধুস্বপ্নভরা কৈশোরের দিনগুলো, জীবনের রিক্ত প্রান্তরে আজ শূন্যতার ব্যথা নিয়ে পড়ে রইল সে একা; কেউ নাই যে তাকে দেবে সান্ত্বনা; শূন্য জীবনের দুঃখের গুরুভার কারও হাসি দিয়ে লাঘব তার হবে না।

ডুকরে কাঁদতে থাকে। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনটা, প্রতিটি

শিখার অনলে সোয়ীর মধুজীবনের এক একটি দিন ছাই হয়ে গেল।

চাঁদ এই দিনে খবরও নিতে এলো না একবার, না আসুক ; সোয়ী ভাববে সে একা ; তার জীবনে আর কেউ আসেনি।

সন্ধ্যা নেমে আসছে, দু'একজন করে চলে আসছে সবাই ডুংরীর দিকে। আগুন নিভে এলো, গন্ গন্ করছে রাতের অন্ধকারে অঙ্গারময় চিতাটা। সোয়ী একা বসে রয়েছে, চোখের জল যেন তার নিঃশেষ হয়ে এসেছে, রুদ্ধ ফোঁপানির আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে তার দেহ।

হঠাৎ পিছন থেকে কার ডাক শুনেই চমকে ওঠে—সোয়ী!

অন্ধকারে ঠিকমত চেনা যায় না, অঙ্গারের নিভন্ত আলোয় দেখা যায় এগিয়ে আসছে সে। ফুকন!

—ফিরে এলাম সোয়ী। কিন্তু ই তুর কি সব্বোনাশ হয়ে গেল!

বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতই সোয়ীর অশ্রু বাধা মানে না, ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। এগিয়ে আসে ফুকন।

কেঁদে কী হবেক সোয়ী? বাবা কারুর চিরকাল বাঁচে না, এইত আমার বাবাও নাই—মাও নাই, তাই বলে কি বেঁচে নাই রে? চুপ কর্।

ডুংরীতে ফিরে এলো তারা দুজনে···রাত্রি ঘনিয়ে আসে। কলসী কলসী জল বুড়োর চিতায় ঢেলে বসুমতী ঠাণ্ডা করে তারা ফিরল।

ফুকন গিরিমাঝির কথা রেখেছে, ডুংরীতে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই দৃশ্য দেখতেই যেন নিয়তি টেনে এনেছে তাকে!

চাঁদের ঘরে যাবি কবে?

জানিনা।

উত্তর শুনে ফুকন একটু বিস্মিত হয়, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনা এ সময়।

আকাশের বুকে একগাদা নক্ষত্রের সমারোহ···মাঝে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র, বোধ হয় ওটারই নাম ব্রহ্মহৃদয়। ফুকন সোয়ীকে একা রেখে যেতে পারেনা, বাইরের একটা ঝুপড়িতে আজ রাত্রিটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। খিদেও তার নাই।

রাঙা সর্দার মারা যাবার সংবাদ পেয়ে সুন্দরমাঝি চাঁদকে বলে, একবার যা রে খপরটো লিয়ে আয়, আর বৌকে লিয়ে আয়—একা থাকবেক সিখানে ?

কথা কয় না চাঁদ। বিনা বাধায় বেশ কিছুদিন লালী মেঝেনের ঘরে রাত্রি কাটান যাচ্ছে, হাঁড়িয়া যত খুসী খাও বাধা দেবার কেউ নাই। রাশ-ছাড়া ঘোড়ার মত উদ্দাম গতিতে চলেছে সে, বেশ আছে। বাবার কথায় জবাব দেয়—আমাকে আজ একবার সাহেবের কাছে যেতে হবেক, কিছু খপর পাওয়া যাবেক।

সুন্দর মাঝি ছেলেকে ক্ষমা করতে পারেনা, এত বড় বিপদের দিনে তারই যাওয়া দরকার। না যাক, নিজেই বার হয়ে যায়।

চাঁদ ঘোড়াটাকে ছোলা দানা খাইয়ে নিয়ে বার হয়ে যায়, হাঁসপাহাড়ির দিকে।

ফুকনের আজ সারা মনে জাগে একটা সমবেদনা—সোয়ীর জীবনের ব্যর্থতা তাকেই আঘাত করে শোচনীয় ভাবে। রাঙা সর্দারের গরু বাছুর জমি জারাত সে নিজেই দেখাশোনা করছে। সোয়ী বলে—বেশ ত ছিলি বাইরে, আবার ফিরে এলি কেনে ?

তুর এই দুঃখ না হলে দেখবেক কে ?···তু ফিরে যা সোয়ী, সোয়ামীর ঘরে লাথি-ঝাঁটা খেয়েও থাকগে।

আমার বাড়ীতেও আমাকে থাকতে দিবি নাই নাকি তু? এরপর আর কথা কয় না ফুকন, গজ গজ করে সে।

লুকে দুষবেক সোয়ী, তাহলে আমাকেই চলে যেতে হবেক আবার।

লুকের কথায় ঝাঁটা মারি আমি। না খেতে পেয়ে মরব লুকের তাহলেই ভালো লাগবেক, না রে?

ফুকন লাঙল জুড়ে নিয়ে বার হয়ে গেল নামো মাঠের দিকে। বেলা হয়ে আসছে—মাটির বতর টেনে যাবে, এই সময় চাষ না দিলে গমও ছিটোন হবে না।

সুন্দর মাঝিকে আসতে দেখে সোয়ী একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। বুড়ো রাঙামাঝির এই মৃত্যুতে তারাও খুব দুঃখ পেয়েছে—সুন্দর বলে চলেছে, কাজ চুকিয়ে ফিরে চল্ তু। ইখানে একলা থাকবি কি করে?

কথা কয়না সোয়ী, তার যেন কোথায় একটা আপত্তি রয়ে গেছে। সুন্দরমাঝি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কারণটা খানিকটা অনুমানও করতে পারে—ডুংরী ঢোকবার মুখেই খবরটা সে পেয়েছে, ফুকন আবার ফিরে এসেছে আর এইখানেই রয়েছে। ব্যাপারটা খুব ভালো লাগেনা সুন্দরের। হাজার হোক তার বাড়ীর বৌ—তাকে নিয়ে পাঁচটা কথা ওঠে, এ সে চায় না।

বলে ওঠে, ইখানে একলা থাকলে লুকে কে কি বলবেক, দরকার কি বাপু ইসব ঝকমারিতে, তু চল উখানে।

সোয়ী ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে। কোন্‌খানে তার অপরাধ জানে না, মিছিমিছি কলঙ্কের পসরা তাকেই বইতে হবে, আর তার ছেলে…তার দোষ তার নীচতা যেন নিন্দনীয় কাজই নয়। বলে ওঠে সোয়ী,

এখনও কিছু ঠিক করিনি, যেতে হয় পরে দেখা যাবেক।

সুন্দর বার হয়ে আসে চিন্তিত মনে। বলে কয়ে একবার চাঁদকে পাঠানো দরকার।

চাঁদ বিনা কাজেই আজ বার হয়েছে। পাহাড়তলির ডুংরীতে যাবেই না, কাঁইজোড়ের ধার দিয়ে আসছে, হঠাৎ ওপারে ফুকনকে চাষ দিতে দেখে থমকে দাঁড়াল। সে ডুংরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল, হঠাৎ বুড়ো সর্দার মারা যাবার পরই তাকে ফিরে আসতে দেখে একটু যেন বিস্মিত হয়ে যায়।

মনে মনে কি ভেবে আবার বাড়ীর পথ ধরে।

সুন্দরমাঝি আজ চাঁদকে বেশ কড়া সুরেই জানিয়ে দেয়, ইসব তুর চলবেনা ইখানে। ডুংরীতে গিয়ে যিমন করে পারিস বৌটোকে লিয়ে আয়, লইলে লুকে আমাদিকে দূষবেক।

চুপ করে থাকে চাঁদ। সুন্দর মাঝি বলে চলেছে,

মেরে ধরে মেয়েটো তাড়ালি—উ ইবার সুন্দর মাঝির মুখে চুনকালি লেপবেক নির্ঘাৎ। ইটো হুঁসগম্যি তুর নাই!

মুখ বুজে খেয়ে চলে চাঁদ। বাবার কথাগুলো হয়ত সত্যি। আজ নিজের চেখে সে ফুকনকে দেখে এসেছে, জানে ওদের ইতিহাস। আজ সোয়ীকে নিয়ে আসতেই হবে, নইলে বাবার কথাই সত্যি হবে।

আজ চাঁদের পৌরুষে ঘা লাগে, তার হাত থেকে সোয়ীকে ছিনিয়ে নেবে আর একজন, এ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। আজই যাবে সে—সোয়ীকে নয়, নারীর উপর পুরুষের অধিকারকে সে কায়েম রাখবার জন্য যাবে। ফুকনকে দেখিয়ে দেবে চাঁদের চেয়ে সে অনেক নীচে, সোয়ীর উপর চাঁদ ছাড়া আর কারুর দাবী নাই।

যাবি তাহলে?

হু, আজই লিয়ে আসব বৌকে।

চাঁদের কথায় দৃঢ়তার সুর।

বিকাল হয়ে আসছে, ফুকন আলুর ক্ষেতে কাজ করছে। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে চারার ছুপাশে মাটি জমা করে মধ্যে দিয়ে জল যাবার পথ তৈরী করছে, চারাগুলোর গোড়াতে সার—গোবর আর শূয়োর-গু মিলিয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে চলেছে।

পশ্চিম আকাশের বুকে অস্তগামী সূর্যের লাল আভা,···বরাকর নদীর বুকে জলধারা রঞ্জিত হয়ে যায়। পাহাড়ের পাশে নেমে গেলো সূর্যের শেষ রশ্মি, মোষগুলোর গলার ঘণ্টার শব্দ নীরব পরিবেশ মুখর করে তোলে—ঘড় ঘড় ঘড়ং···

লাল ধূলো আর ঘণ্টার শব্দ···পাহাড়তলীর প্রান্তর ভরিয়ে তোলে। বনের মাথায় ফিকে অন্ধকার নেমে আসছে—

সোয়ী অসময়ে চাঁদকে আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। উঠোনে পা দিয়ে আবার দাওয়ায় উঠে গেল। একা ওর সামনে বার হতে আজ ভয় করে সোয়ীর। চাঁদ নিজেই একটা চারপাইএ বসল—

বসতে তুমি বলবা নাই, নিজেই বসি। দূরে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সোয়ী। বলে চলেছে চাঁদ—

বাবা বললেক তুমাকে লিয়ে যেতে, তাই আইছি।

কেনে? মারধোর করবার লুক পেছ না?

তা তুমি বলবা, সত্যিই অন্যায় কাজটো হয়ে গিইছিলোন সিদিন।

আর আগে যি তার চেয়ে অন্যায় কাজটো করেছিলা—তার কি করলা?

দোষটো তুমি একা আমারই দেখলা?

মেয়েছেলের দোষ এতে বেশী নাই। তুমি তাকে মিছে কথা বলেছিলে, সি মেয়েটোকে এর চেয়ে খুন করে ফেলালেই হয়ত উপকার করতা তার।

চাঁদের মেজাজ ক্রমশঃ সপ্তমে চড়ে যায়, সোয়ীর কাছে এসব শুনতে সে আসেনি। তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। বলে ওঠে,

উসব কথা যাক—তুমাকে যেতে হবেক।

জোর করে লিয়ে যাবা নাকি? আমি যদি না যাই?

সোয়ামীর ঘর—

কে আমার সোয়ামী? কুন সম্বন্ধ আমার সিথানে নাই।

সোয়ী! চীৎকার করে ওঠে চাঁদ। এ যেন বিশ্বাসই করতে পারেনা।

সোয়ী আজ মরীয়া, সে চীৎকার করে ওঠে,—

হুঁ তকি! সাতাশীর সামনে বুলব আমি তুর গুণের কথা, তুর মত সোয়ামী আমার চাই না, চাই না। তালাক দিতে হয় তাই দুব।

গর্জন করে উঠে চাঁদ—

বাপের বিটি হোস তাই করবি। ওই ফুকনাকে লিয়ে ঘর কর্। লাগর ফিরে আইচে কিনা, তাই তুর এত দিমাক!

সোয়ী উত্তেজনার বশে নেমে আসে দাওয়া হতে, কাপড় চোপড় তার ঠিক নাই,—বলে ওঠে, আমার ঘরে বসে যা করতে হয় করব। তুর ল্যাজ লাড়া আমি সইবনা। যা পারিস তুই করবি যা—

আচ্ছা,—চাঁদ উঠে পড়ে, কোন রকমে রাগ সামলিয়ে বার হয়ে যায়। উত্তেজনার আবেগে হাত পা কাঁপছে সোয়ীর। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানেনা, ফুকনের ডাকে চমকে উঠে সে। গোয়ালে ছানি কাটছিল ফুকন, ওদের ঝগড়াটা সবই শুনেছে। শুনেছে তাকে কেন্দ্র করেও নানা কুৎসিত ইঙ্গিত।

আজ সোয়ী শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গেও সব সম্পর্ক শেষ করল, এটা ফুকনের ঠিক ভালো লাগেনা। বলে ওঠে সে,—

এতটা না করলেই পারতিস সোয়ী। তুই ফিরে যা।

না, যা ভালো বুঝেছি আমি করেছি !

তাহলে আমাকেই চলে যেতে হয় ইখান থেকে।

উদের ডরে? সোয়ী মুখ তুলে চায়, ডাগর চোখ দুটোতে তার ছলছল বারিধারা। সে তেজ কোথায় চলে গেছে, চাহনিতে ফুটে বার হয় একটা ব্যাকুল মিনতি। ফুকন এগিয়ে আসে—

না তা লয়। তবে তুর নামে পাঁচজনে পাঁচটো কুকথা বলবেক উটা কি আমার ভালো লাগবেক রে? আমার কথা ছেড়েই দিলাম, আমার মানও নাই অপমানও নাই। কিন্তু তুর?

উদের মত লুকের কথার কুন দাম নাই ফুকন। তুরা চিনিস নাই উদিকে, আমি চিনেছি, হাড়ে হাড়ে চিনেছি। উরো আমাকে লিয়ে গিয়ে মেরে ফেলাতো নির্ঘাৎ। এই দেখ্...

কপালের ঘা-টা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু লম্বালম্বি কাটা দাগটা এখনও দগদগে হয়ে রয়েছে।

বল্ তু, আবার সিখানে যাবো উয়ার পর?

চুপ করে যায় ফুকন। সোয়ীর চোখে আজ বিদ্রোহের আগুন, সমাজ, সাতাশী রীতি সবকিছুর বিরুদ্ধে সে আজ প্রতিবাদ করতে চায়। ওদের সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা আঘাতের জবাব দিতে সে আজ মুঠো শক্ত করেছে। পারবে কি ফুকন তার সঙ্গে হাত মেলাতে?

পারতে হবে। সোয়ী মেয়ে হয়ে পেরেছে, আর সে পুরুষ হয়ে আজ পারবেনা?

মানুষের শয়তানীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের খতিয়ানে স্বাক্ষর দিল আজ আরও দুজন: আবছা অন্ধকারে আকাশের নক্ষত্র আর রাতের বাতাস রইল তার সাক্ষী।

আনমনে আসছে আরুলাম্থান, বনতুলসীর ফাঁক দিয়ে কাঁকর ঢালা রাস্তাটা ধরে। রাতের অন্ধকারে কিছুই ভালো দেখা যায় না, হঠাৎ একটা গোঙানির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল সে ঃ শব্দটা একটু দূরের ঝোপের মধ্যে থেকে আসছে।

এগিয়ে যায়, হঠাৎ একটি মেয়ের চীৎকারে থমকে দাঁড়াল। ঝোপ ভেদ করে এগিয়ে যাবে, তারার আলোতে দেখা যায় একটা ফাঁকা জায়গাতে পড়ে রয়েছে একটি মেয়ে, যন্ত্রণায় সারা দেহ তার মুচড়ে উঠছে। চীৎকার করে ওঠে মেয়েটি—

দোহাই তোমার, এসোনা, এসোনা!

থমকে দাঁড়াল আরুলাম্থান! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনা। একটা মেয়েকে এখানে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। কি ভেবে নেমে যায় নিচের ধাওড়ার দিকে।

বুড়ি মেঝেনরা বার হয়ে আসে তার হাঁকডাকে, মালকাটা দুচারজন কেরাসিন কুপি নিয়ে বার হয়। লাঠি বল্লম নিয়ে বুড়ি মেঝেন কজনকে সঙ্গে নিয়ে তারা আরুলাম্থানের সঙ্গে উপরের দিকে উঠে আসে জঙ্গল ভেদ করে।

আর চীৎকার শোনা যায় না। চারিদিক নীরব। আরুলাম্থান বিস্মিত হয়ে যায়। হঠাৎ রাতের অন্ধকারে একটা চীৎকার শুনে থমকে দাঁড়ায় তারা।

সদ্যোজাত শিশুর চীৎকার!

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হয় আরুলাম্থানের কাছে। কিন্তু এই জঙ্গলে এভাবে কেন আসবে এই মেয়েটি? বুড়ি মেঝেন এগিয়ে যায়। অচেতন দেহটা রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। তারকিনী আকাশের দিকে চেয়ে হাত পা নেড়ে খেলা করছে একটি শিশু—জানেনা সে কী ভাবে পৃথিবীতে এলো। নবজাতককে বরণ করে নিল—মানুষের সমাজ

নয়, কয়েকজন মালকাটা আর মেঝেন, আর স্বাগত জানাল তাকে আকাশের অগণিত নক্ষত্র। বিরাট বিশ্বে রাতের অন্ধকারে বনতুলসীর জঙ্গলে পা ফেলে এল নবযুগের এক শিশু। নাম নাই পরিচয় নাই, গোত্রও তার অজ্ঞাত। মানুষের সন্তান···সেও মানুষ, এই তার একমাত্র পরিচয়।

আরুলাস্থানের ঘরেই আশ্রয় পেল তুরী আর সেই নবজাতক শিশু। তুরীর সারা মনে ঝড় বয়ে চলে, তার জীবনের এই পরিবর্তনটা মেনে নিতে পদে পদে কোথায় তার বাধে। ছোট ছেলেটা মাঝে মাঝে হাসে···, তুরী বিস্মিত হয়ে যায়। ও কিছুই জানেনা ওর জীবনের কাহিনী, তাই হাসে, নাহয় জীবনকে জয় করার দাবী নিয়েই হাসির লহর খেলে যায় ওর সারা মুখে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় তুরীর। আরুলাস্থান তাকে কোন দিনই জিজ্ঞাসা করেনি ওর জীবনের কাহিনী, জানতেও চায়নি সে। সাদরে নিয়ে এসেছে ওদের, ঠাই দিয়েছে ; শূন্য ঘর নবজাতকের হাসিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলেছিল তুরী—

আমাকে না জেনেই লিয়ে এলে তুমি ?

জানবার দরকার নাই। তবে আন্দাজ করতে পারি তোমার জীবনের কাহিনী।

তবু আমার ওপর এত দরদ কেনে ?

ছেলেটাকে দেখিয়ে সে বলল—তোমার উপর নয়, ওর উপরই কর্তব্য রয়েছে, আমি যে ওরই দলে তুরী ! আমার জন্মটাও অমনি রহস্যে ঢাকা। এক অপমানের পরিচয় বযে বেড়াচ্ছি আমি। তার জবাব দিতে চাই। যে কেউ সেই লাঞ্ছনার বোঝা নিয়ে আসে সেও আমাদেরই দলে।

বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে তুরী ওর মুখের দিকে। একটা শ্রদ্ধায়, ব্যথায় মনটা রাঙা হয়ে ওঠে ওর—সত্যি ?

হ্যাঁ, বলব পরে একসময়। বাইরে যেতে হবে দুদিনের জন্যে, কাজ আছে।

দু'একটা জিনিষপত্র, বই খানকয়েক নিয়ে ঝুলি ভর্তি করতে থাকে আরুলাম্বান। ব্যাপারটা কেমন যেন হেঁয়ালি বোধ হয় তুরীর কাছে। নিজেও খানিকটা সান্ত্বনা পায় আজ, পায় পরম নির্ভর। একা সে-ই মানুষের দেওয়া কলঙ্কের ছাপ বয়ে বেড়াচ্ছে না পৃথিবীতে, আরও অনেক আছে···কালিতে কালো হয়ে এসেছে তাদের মুখ, তবু অন্তরের আলো কোনদিনই নিভে যায় না।

না খেয়ে যাবানা কিন্তুক, চাট্টি চাল ফুটিয়ে দিছি এখুনিই।

এই সেরেছে! হাসতে থাকে আরুলাম্বান। তুরী চলে গেলো চুলো ধরাতে। আরুলাম্বান ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে, বলিষ্ঠ কালো একটা ছেলে···দুহাত মুঠিবদ্ধ করে কিসের যেন প্রতিবাদ করতে চায়, কাঁদেও কম। আরুলাম্বানের দিকে চেয়ে চোখ দুটোতে ওর হাসির আভা খেলে যায়···ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে ক্রমশঃ কচি মুখের উপর। তার প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে আরলাম্বানের মুখেও।

এদের হাসি আর দুঃখই এনে দেবে তার সারা মনে দুর্বার সংগ্রামী শক্তি, এদের অত্যাচার-পীড়িত জীবন এনে দেবে তার মনে মহাজীবনের ইঙ্গিত,···ফুলে সাজানো মাটির বুকে তাদের দাবীর প্রতিষ্ঠা।

ওদের ডুংরীর পাশ দিয়েই সদর রাস্তা, সভ্যজগতের দিকে যাবার পথ। সেদিন মাঠে ধান কাটছে ডুংরীর সকলে। সুন্দর মাঝিও তদারক করে গাড়ীবোঝাই করছে ধানগুলো। কেউ বা গাদা দিচ্ছে ধানের স্তূপ। বৃষ্টির আভাস দেখা দিয়েছে—আকাশের বুকে ধোঁয়াটে মেঘের আস্তরণ। তাই যে যত তাড়াতাড়ি পারে বছরের ফসল ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চাঁদ কদিন থেকেই ডুংরীতে নাই।

পাহাড়ীর মধ্য থেকে একদল মাঝিমেঝেনকে ছেলেপুলে, বাকঁবন্দী, ছেড়াতালাই···কালি লাগা মাটির হাঁড়ি, ছুএকটা কুকুর নিয়ে সদর রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে···সুন্দর মাঝি থমকে দাঁড়ায়। দলে দুএকজন বুড়োও আছে। আগে আগে চলেছে দুজন হাফপ্যাণ্ট পরা লোক। ওদের মাঝেমাঝে চাঁদের সঙ্গে দেখেছে ঘুরতে।

হো···ই···

সুন্দরের হাঁকে থমকে দাঁড়াল দলটা। ওদের জাতের চেনা ডাক। সঙ্গের লোকজন একটু অস্বস্তি বোধ করে। মাঠ থেকে মাঝিরা দু'একজন ছুটে যায়, সুন্দর মাঝি গিয়ে পৌছেছে তখন ওদের কাছে।

ডেরা তুলে চলেছে মাঝিরা নতুন জীবিকার সন্ধানে। সুন্দর জিজ্ঞাসা করে, কুথা যেছিস ?

—হুঁ···হুঁথাকে। আঙুল দিয়ে সামনের পানে দেখিয়ে দেয় মাঝিরা। ব্যাপারটা বুঝে নেয় সুন্দর। লোকটা বলে চলেছে—

নগদ পয়সা দিবেক, ঘর বানাই দিবেক, খেতে দিবেক।

—তাই জাতকরম, বোঙার থান ছেড়ে উদের উখানে যেছিস ?

হাফপ্যাণ্ট পরা আড়কাঠি দুজন এগিয়ে আসে। তারা বুঝতে পারে ব্যাপারটা কী। আরও কিছুক্ষণ যদি সুন্দর মাঝি ওদের এইসব কথা শোনায় ওরা পালাবে নির্ঘাৎ, এত খাটুনি সব বৃথা যাবে। কোনরকমে এদের কলিয়ারিতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেই মাথা পিছু নাহোক দু টাকা আসবেই। বলে ওঠে তারা—

—ভাল ডাওরি আসবেক রে, চল তুরো তাগাদা। বুড়ো মাঝিরা নীলাভ পাংশু চোখ মেলে উদাত্ত আকাশ···বিস্তীর্ণ জঙ্গলের দিকে শেষ-বারের মত চেয়ে নিয়ে দলের উদ্দেশ্যে বলে,—হুঁ বাবু, বাঁক তোল।

থমকে দাঁড়িয়ে রইল সুন্দর। ওঁরাও সাঁওতালের দল সামনের কোন্ স্বপ্ন-দেখা রাজ্যের দিকেই চলে গেল!

আড়কাঠি লাগিয়ে উদিকে ভিটে ছাড়া জাতছাড়া করে দিলেক্ রে!

মাথা নাড়ে সুন্দর। এমনি করে দেখে আসছে ওদের দলের ওদের জাতের প্রাণশক্তি কেমন ভাবে নিঃশেষ করে নিলে ওরা, বন থেকে মুক্ত বিহঙ্গদলকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে কঠিন বন্ধনে বন্দী করে রেখে দেবে। কোন্‌দিন দেখবে সর্দার আর তার ডুংরীর দলকেও ওই পথে যাত্রা করতে। ওদিকে যারা গেছে কেউ আর ফিরে আসেনি। তবুও যায় তারা। চিরন্তন অগস্ত্যযাত্রার আর শেষ নাই।

আড়কাঠি শালোদিকে কাঁড়ে করে গেঁথে দুব?

না।···

ছেলেটা বলে ওঠে, শালোদের দু'একজনকে শ্যাষ করে দিলে ভয়ে আর আসবেক না!

টাকাগুলো গুনে নিয়ে চাঁদ পকেটে পোরে, কর্‌করে কতগুলো নোট। ছোট সাহেব তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। বড় খাতা-খানায় নূতন আমদানী করা মাঝিগুলোর নাম লেখা হলো। কর্মক্ষম লোক আছে বাহান্ন জন, মেয়ে আছে পঁয়ত্রিশ; আর সব ছোট ছেলে মেয়ে।

বুড়ো মাঝি অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে চারিদিক। স্টীম লিফ্‌টের ঘট্ ঘটাং শব্দ—ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লারটা ভোঁস্ ভোঁস্ করছে—ওদিকে নিচে থেকে পাম্প করে জল উঠছে। সব কিছুই তাদের কাছে বিচিত্র!

মেঝেন মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যেই ঠেলাঠেলি করে হাসছে, জায়গাটা ভরে গেছে ওদের কলরবে। বুড়ো মাঝির মনে কেমন যেন একটা বিজাতীয় আতঙ্কের ছোঁয়া দেখা দেয়। চাঁদ তার হাতে দুটো চকচকে টাকা দিয়ে বলে ওঠে—

টিপছাপ দাও।

টিপছাপ! মাঝি কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে ব্যাপারটা। এত সব বলে আনে নি ত! কম বয়সী মাঝিমেঝেনরা নূতন আবহাওয়ায় নূতন পরিবেশে আনন্দে অধীর হয়ে যায়, বুড়ো মাঝির মনে ফেলে-আসা জীবনের ব্যাকুলতা। কেন জানে না— এদের সে বিশ্বাস করতে পারে না। তবু আর ফিরে যাবার পথ খুঁজে পায় না, বাঁহাতের বুড়ো আঙুলে কালি লাগিয়ে ওরা ছাপই দিয়ে দেয়। চাঁদ ছোট সাহেবকে বার কতক সেলাম করে বার হয়ে আসে।

ব্যাপারটা হয়ত চাপাই পড়ে যেত। ডুংরীর পাশ দিয়ে মাঝি-মেঝেনের ছন্নছাড়ার মত অগস্ত্যযাত্রা এদের জীবনে নূতন নয়। বন থেকে চলেই যায় ওরা, গিয়ে ওদের গহ্বরে পড়ে। ঋণের বোঝা—শাসন এবং আইনের বাঁধন হতভাগাদের এমনি করে পাকে পাকে জাড়িয়ে ধরে যে তার থেকে মুক্তিলাভ করার সাধ্য ওদের হয় না! স্মৃতিও পুরোনো থেকে জীর্ণ হয়ে নিঃশেষিত হয়।

সেদিন সুন্দর কোথা থেকে ফিরছে, জোড়ের ধারে খাড়ির মধ্যে চাঁদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল। একটা লোক কাঁদছে! বুড়োর কান্না যেন আর্তনাদ হয়ে ওঠে—

তু কেনে মিছে কথা বলেছিলি আমাদিকে; ঘর দিবেক—চাকরী দিবেক—খেতে দিবেক ওষুধ দিবেক—ইসব মিছে কথা বললি কেনে? সাঁওতালের রক্ত তুর গায়ে নাই?···ইখন ফিরে যেতে চাইলে বলে, জেহালে ভুব···!

চাঁদ বলে ওঠে, আমি কি জানি ইসবের?

তু জানিস না? কেনে বার বার ডুংরীতে যেয়ে পয়সা মার্লা

দিয়ে এসেছিস ? চিনকুঠি থেকে আমাদিকে বিচে দিয়ে টাকা—ইয়া লোট লিস নি তু ?

সুন্দরের সারা শরীর ঘৃণায় শিউরে উঠে। তারই ছেলে কিনা শেষকালে নিজের জাতকেই বিক্রী করে দিয়ে আসছে ওদের ঘরে ! ওই চাঁদ···তারই ছেলে কিনা এত বড় বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়িয়েছে ! শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে, মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। লোকটা বলে চলেছে—

বোঙা যদি থাকে ইয়ার বিচার করবেক। ভুলিয়ে ভালিয়ে লিয়ে এসে তুরই জাত জ্ঞিয়াতকে বিচে দিলি ! এইবার কুনদিন তুর বাবা—মা—ঘরের বৌটো বিচে না দিস ত তালাক রইল তুকে। এখনও সুরয বংহা আছে—মাটিতে ফসল হছে···

হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে বুড়ো যেন পড়ে গেল মাটিতে। কিসের একটা গোঙানির শব্দ। লোকটাকে চাঁদ মারছে।···পাথরের আড়াল থেকে বার হয়ে সুন্দর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সামনে।

এ্যাই ! বাবার গর্জন শুনে থমকে দাঁড়াল চাঁদ। সুন্দরের মুখের দিকে চাইবার সাহস তার নাই। রাগের মাথায় বাবরি চুলগুলো সিংহের কেশরের মত ফুলে উঠেছে, চোখ ডুটোতে জমা হয়ে গেছে খানিকটা রক্তের গাঢ় লালিমা।

ছেড়ে দে উকে !

বুড়ো মাঝি আর কেউই নয়, সুন্দর যাকে সেদিন ধান কাটার সময় দেখেছিল চলিষ্ণু মাঝি দলের সঙ্গে সেই বুড়ো। দাঁতের গোড়া থেকে আঘাতের চোটে রক্ত বার হচ্ছে ! বলে ওঠে—

সবাইকে মেরেছিস, আমার ছোট লাতিটাও কাল মরে গেইছে। মরবার কালে বলছিল, ডুংরীতে ফিরে চল, ইরো বাঁচব নাই ! ঐ জল খেতে লারছি, ঐ ভাত তুষ পারা লাগছে, হাওয়ায় দম বুজে আসছে !

আমাদিকে কিন্তুক যেতে দিলেক নাই, বলে—যাবি কুথাকে—জেহালে ডুব! লাতিটো মরে গেল কাল। বলতে এলাম উই আড়কাঠিকে—তাই মারলেক—তু দেখ্!

বুড়ো চলে গেল, কলিয়ারির দিকে নয়, তারই ফেলে আসা বন-পাহাড়ীর দিকে। দলের সবাইকে ছেড়ে একাই সে ফিরে গেল অতীত জীবনে।

জোড়ের বালিয়াড়ির ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাপ বেটায়, চাঁদের মুখে কথা নাই, সুন্দরের চোখে আগুন। ব্যাপারটা সমস্তই প্রকাশ পেয়ে গেছে সুন্দরের কাছে। জাতের কাছে—সমাজের চোখে আড়কাঠি বা দালালের কোন ঠাঁই নাই। আজই যদি জানতে পারে সকলে, সুন্দরকে পরিত্যাগ করতে হবে ওই আপদকে। বলে ওঠে সুন্দর—তুর ঐ কথা শুনবার আগে আমার মরণটো হলে হায় করতাম। এত লালস তুর!

বলে চলেছে সুন্দর—এত টাকা ওজকার করতে হয়—ইখান থেকে ই মুলুক থেকে চলে যাবি, আমার ছেলে বলে জানান দিবিনা। কুন সমন্ধ রাখবি না। আর যদি ইখানে ঐসব পাপ কাজ করবি···জীবনে শ্যাষ করে ডুব। তুকে মেরে ফেলালে এক সরযে-ভোরও পাপ নাই। পুন্যি হবেক···সাঁওতালদের একটো পাপ যাবেক। ছিঃ ছিঃ···

লজ্জায়—ধিক্কারে—ঘৃণায় সুন্দরের সারা মন ভরে ওঠে। চাঁদের মনে চলেছে বিদ্রোহী কোন পশুর জাগরণ।

পাহাড়ের নীচে ডান্‌কান সাহেবের শিকারের ছাউনি পড়েছে। পাশাপাশি কয়েকটা তাঁবু, বেয়ারা বাবুর্চি মশালচি বরকন্দাজ আছে সবই, সর্বোপরি আছে চাঁদ। তাজাতাজা মুরগীগুলোকে বেঁধে রেখেছে চাঁদ, ঘরে বাঁধা মুরগী না হলে সাহেবের খানার টেবিলে পৌছয় না, ছাড়া থাকলে ওদের নাড়িভুঁড়িতে মানুষের মলও নাকি পাওয়া যায়।

কলিয়ারির এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার মিঃ রোজারিও এসেছে। ছোকরা সাহেব গভীর নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখে চলেছে এদের জীবন—দারিদ্র্য অনাহার-প্রপীড়িত জীবন, অথচ কাব্যে সাহিত্যে এসেছে এদের সহজ সুন্দর জীবনযাত্রার জয়গান। হয়ত সুন্দর ছিল এদের জীবন, আজকের সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এরা হারিয়ে ফেলেছে সেই দিনগুলোকে।

চকচকে কয়েকটা উইন্‌চেস্টার 444 হেভি রাইফেল লাইট রাইফেল সাজান রয়েছে মিঃ ডান্‌কানের তাঁবুতে। সকালের মিঠে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বাবুর্চিদের তাঁবুর বাইরে হতে খানিকটা ধোঁয়া ঘুরপাক দিয়ে শীতের আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। মিঃ 'রোজারিওকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন মিঃ ডান্‌কান তাদের শিকারের কর্মসূচী।

ডানদিককার জঙ্গলটা সমস্ত বীটার দিয়ে বীট করিয়ে নিয়ে আসবে নীচের দিকে···সামনের কেঁদ গাছের উপরের মাচানে থাকবেন তিনি আর বিপরীত দিকের ওখানে একটা মাচানে রোজারিও। কোন জানোয়ারই পার হয়ে যেতে পারবেনা।

চাঁদ এসে একগাল হেসে সেলাম করে, Good morning সাহেব।

Beater ?

নাই আসবে Sir, অনেক করে লিয়ে এলাম One rupee দিতে হবেক জনাকে!

হাত মুখ নেড়ে চাঁদ কোন রকমে বুঝিয়ে দেয় ব্যাপারটা।

আহেরিয়ার শিকার। আজকের দিনে এ বনে শিকার করতে কেউ পারেনি এতদিন সাঁওতাল ওঁরাওরা ছাড়া। ওদের জাতীয় উৎসবে আজ পরের হয়ে ভাড়াটে বন ঝাড়নদার হতে কেউ চায় নি। বুড়ো ছোকরা সকলেই আপত্তি করে—

না হবেক নাই, সাহেবদিকে আজ কাল ছুদিন শিকার করতে দুব নাই, ই আমাদের বন।

চাঁদ গজরাতে থাকে। সুন্দর মনে মনে অনুভব করে ব্যাপারটা। দশ বিশখানা গাঁয়ের সাঁওতাল ওঁরাওরা সমবেত হয়েছে, আহেরিয়ার দিনে ওরা সাহেবকে বনে ঢুকতে দেবেনা, পয়সা দিয়ে বন ঝাড়তে যাওয়া ত দূরের কথা!

চাঁদ বলে ওঠে, বনের ইজারা লিয়েছি আমি। যদি বনে ঢুকতে না দিই তুদিকে?

বাধা দেয় সুন্দর—চাঁদ, বাড়াবাড়ি করিসনা!

নানো ডুংরীর ফুকন এগিয়ে আসে, জবাব দেয় সে—বনের কাঠ পাতার ইজারা লিয়েছিস তু, জন্তু জানোয়ারের ইজারা ত লিস্নি!

ফুকনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চাঁদ একবার দপ করে জ্বলে ওঠে, সোয়ীর কথা মনে পড়ে যায় তার। কিন্তু চেষ্টা করে তখনকার মত রাগটা চেপে যায় সে। সুন্দর ব্যাপারটা মিটমাটের চেষ্টা করে—

আইছে সখ করে শিকার খেলতে, তাদিকে তাড়াই দিবি তুরো? না দিবি গিয়ে বলে দিই গা!

সাঁওতাল ওঁরাও জাতের আতিথেয়তায় বাধে। এরা ঘরে কিছু না থাকলে নিজেরা উপাস করেও অতিথিকে সমাদর করে। এমনি একটা জায়গাতে সুন্দর আঘাত করে। বুড়োরা চুপ করে যায়, ছোকরারা গজরাতে থাকে—আতিথেয়তা আর অন্যায় দাবী দুটো এক নয়। সুন্দর টাকা কড়ি কবুল করে তার নিজের ডুংরীর লোকজন সংগ্রহ করে।

অসন্তুষ্ট মনে ফিরে গেল অন্যান্য সাঁওতালরা। তাদের জন্মগত অধিকারে আজ হাত পড়েছে, এটা তারা ঠিকমত সহ্য করে না।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন ঝাড়াই শুরু হয়, পাহাড়ের নিচু ডুংরী হতে সমবেত কাড়া নাকাড়ার শব্দ···সমবেত চীৎকার ভেসে আসে মিঃ ডান্‌কানের তাঁবুতে। তাড়াতাড়ি বার হয়ে আসেন তিনি—

Roserio—

রোজারিও বার হয়ে আসে।

Who are they ? Who the hell have started howling ?

চাঁদ ছুটে আসে। ওপাশের চীৎকারে বন পাহাড় হতে দুএকটা বরা ইতিমধ্যে বার হয়ে ছুট ধরেছে গভীর বনের দিকে, এদিকের বনে ওসব কিছু থাকবেনা। সাহেব রাইফেলটা নিয়ে বাইরে আসেন, **Breakfast** টেবিলেই পড়ে রইল।

ব্যাপারটা রোজারিওর কাছে প্রকাশ করে সুন্দর মাঝি,—আজ তাদের নাকি জাতীয় পরব, আহেরিয়া।

রোজারিও বিস্মিত হয়ে যায়,—ইয়ে বাত কাহেকো নেই বোলা ? এসেছেন আপনারা, রেগে যাবেন, গোসা হয়ে যাবেন কিনা ?

Strange !

চাঁদ ও সুন্দর দুজনেই অপমানিত বোধ করে ব্যাপারটাতে। বলে কয়ে গিয়ে এই ভাবে সমস্ত বন ঝাড়াই করে শিকার তাড়ান মানেই এদের অপমান করা। মিঃ ডান্‌কানও তৈরি হয়ে নেন। তাঁর দলের বীটাররা বন ঝাড়াতে শুরু করে দেয়, এবং তিনি মাচানে না উঠে লাইট রাইফেল কাঁধে নিয়ে নিচেই এগিয়ে যান। রোজারিও বোঝাবার চেষ্টা করে—

Mr. Duncan, let it go, we shall try another day.

মিঃ ডান্‌কান কথা বলেন না, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাঁদ আর একবার রোজারিওর দিকে চেয়ে এগিয়ে চলেন বনের মধ্যে। বাধ্য হয়েই তাদেরও সঙ্গী হতে হয় সাহেবের।

চারিদিকে গোল করে পাহাড় উঠে গেছে, তারই গা বেয়ে নেমে এসেছে বনভূমি। এপাশে মিঃ ডান্‌কানের বীটাররা বন ঝেড়ে আনছে, ওদিকে অগণিত সাঁওতাল ওঁরাওএর দল নেমে আসছে পাহাড় বেয়ে নাগারা টিকারা পিটিয়ে। মাঝখানটা মোটেই নিরাপদ নয়। তাড়া খাওয়া জানোয়াররা দুদিক থেকে ছুটে আসছে প্রাণভয়ে, তার মধ্যে দিয়ে হাঁটা-পথে এগোনো অসম্ভব। যে কোন মুহূর্তেই বিপদ আসতে পারে। জংজানোয়ারের আক্রমণ কিংবা সাঁওতালদের বিষ কাঁড়, দুটোই আসা সম্ভব।

বাধা দেয় চাঁদ,—সাহেব, মৎ যানা!

You damned fool! এগিয়ে চলেন মিঃ ডান্‌কান বীরদর্পে।

একটা শাল ঝোপের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ান সাহেব। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে একটা মাদী ভালুক, পেছনে তার গোটা দুয়েক বাচ্চা। ভালুকটার পিছনে আসছে তাড়া করে একটা সাঁওতাল।

রাইফেলের নলটা রোদের আভায় চিক্‌চিক করে ওঠে। একটা আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ব্যাহত হয়ে আসে—ভালুকটা পাশ দিয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত বার হয়ে যায়, পড়ে যায় লোকটা। আর্তনাদে ভরে ওঠে আকাশ বাতাস। পাঁজরের কাছে গুলিটা লেগেছে, ঢালু পাহাড়ীর গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়ছে, ঝুপড়ি গাছের সবুজ পাতাগুলো রক্তের দাগে রঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে।

থেমে যায় ওদের কোলাহল, টিকারা নাগারা নীরব হয়ে যায়, সারা বনভূমির মাঝে নেমে আসে শান্ত নীরবতা। মাঝি-ওঁরাওরা লোকটির দিকে চেয়ে থাকে; রক্তপাতের ফলে ক্রমশঃ নিথর হয়ে আসছে লোকটা।

মিঃ রোজারিও ক্ষুব্ধ জনতার সামনে এগিয়ে যান। ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করেন তাদের। একটি মেঝেন এসে পড়েছে, তার কান্নার শব্দে মুখর হয়ে ওঠে নিস্তব্ধ পরিবেশ। মিঃ রোজারিও তাকে কিছু টাকা দিতে যান, বুড়ো সারান মাঝি বাধা দেয়—

না, দিতে হবেক নাই তুকে টাকা, জান দিতে পারবি তবে ফিরিয়ে দিয়ে যা তু। টাকা উ লিবেক নাই।

হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রোজারিও। মিঃ ডান্‌কান পায়চারি করছেন তাঁবুর সামনে, মুখের পাইপটাতে জোরে টান দিয়ে চলেছেন···তাঁবুর বাইরে ঠেসান রয়েছে রাইফেলটা, আর কয়েকটি বন্দুক রাইফেল রেডি করে রেখেছেন : যদি ওরা চড়াও হয় তার জবাব দিতে তিনিও প্রস্তুত।

মাঝিরা চড়াও হলো না, রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত নীরবে ফিরে গেল তারা সমস্ত আক্রোশ চেপেই। লোকটার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গেল তারা—বনপাহাড় আর পালল শিলার বুকে রক্তের আখরে স্বাক্ষর রইল তাদের আহেরিয়া-শিকারের কাহিনীর। এমন ঘটনা কোন দিনই ঘটেনি তাদের ইতিহাসে। অত্যাচারীর গুলিতে প্রথম প্রাণ দিল নামো ডুংরীর শুকন মাঝি। সুন্দরের চোখ দিয়ে জল বার হয়ে আসে। এ পাপ চাঁদেরই ; সুন্দর আজও স্বীকার করছে তাকে ছেলে বলে, কিন্তু আর কতদিন ?

থানা—পুলিশ—আইনের হাত এখানে সহজে পৌঁছয় না নিগ্রীহিতকে রক্ষা করতে, তাই শুকনের জন্যও কিছু বাধার সৃষ্টি হলোনা। কাঁইজোড়ের ধারে কেঁদ আর শুকনো শাল কাঠের আগুনেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল, মুষ্টিমেয় ছাই আর অঙ্গারের রাশি শুধু পড়ে রইল সবুজ ঘাসের বুকে। শুকনের কথা ভুলে যাবে এরা, দুদিন পর শ্যামলা মেঝেন হয়ত কাউকে সাঙা করবে, ব্যস্। আবার কী থাকবে তার ? এদের জীবনে থাকবার আছেই বা কি ?

…খবরটা কিন্তু চাপা থাকল না…লোকের মুখে মুখে পৌঁছে গেল অনেক দূর অবধি। মহকুমা সহরেও।

কলিয়ারি, লোহার কারখানা, ছোট বড় আরও কয়েকটা কারখানাকে কেন্দ্র করে সহরটা গড়ে উঠেছে। এককালে এখানে ছিল টিলা আর নিচু জমিতে ধানক্ষেত। দিন দুপুরে টিলার আড়ালে সামান্য দু-চার আনা পয়সার জন্য মানুষ ঠেঙিয়ে মারত ঠ্যাঙাড়ের দল।

ক্রমশ কয়েকটা লোহার কারখানা গড়ে উঠল, বাসা বাঁধল হাজার হাজার শ্রমিক…আশপাশের বন্ধ্যা বন্ধুর প্রান্তরের নিচে মাটির অতলে সন্ধান পেল অর্থলোলুপ বিদেশীর দল কালো সোনার, ধীরে ধীরে বসল জনপদ। আজ পূর্ণমাত্রায় এক সাহেবী সহরে পরিণত হয়েছে। রাস্তার দুপাশে সাজান বাংলো, গাড়িবারান্দায় ঝকঝকে নতুন গাড়ি, টেলিফোনের তার বিস্তার লাভ করেছে পাহাড়ীর উঁচু নিচু বেয়ে।

দূরে লোহার কারখানার চিমনিগুলো অবিশ্রান্ত ধূম উদ্গীরণ করে চলেছে, রাতের অন্ধকার গলানো লোহার পরিত্যক্ত স্লাগের আভায় লাল হয়ে ওঠে…। অতল অন্ধকারে দূরে কোন কলিয়ারির বিজলীর আলো জনহীন প্রান্তরকে জাগিয়ে রেখেছে।

যাত্রীবাহী বাসে করে এসে পৌঁছল আরুলাস্থান সহরে। সাধারণ একজন ডেলিগেট হয়ে এসেছে তাদের কলিয়ারি হতে। ফাদার ক্রমফিল্ডের আমলের জীর্ণ কোটখানার বুকে পিন দিয়ে সেঁটেছে ব্যাজটা। আশেপাশের লোক তার দিকে বার বার চায়।

শীতকাল। পাথুরে মাটি ভেদ করে ঠাণ্ডা উঠছে, হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। লোকো শেড এবং পাহাড়ীর ওপারের লোহার কারখানার ছোটবড় চিমনির কালো ধোঁয়া আকাশকোলে চেপে বসেছে…আরুলাস্থান পায়চারি করে, কোথাও একটু থাকবার জায়গা দরকার। কাল থেকে মীটিং শুরু হবে, পথে দু-চার জন ডেলিগেটকে সেও দেখেছে কিন্তু তাদের

ডেকে কথা বলার পর থাকবার ঠাঁই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি।

রাস্তার ধারে একটা সাইন বোর্ড লাগান রয়েছে—গোল্ডেন কৈলাস হিন্দু হোটেল। ভদ্রমহোদয়দিগের আহার ও বিশ্রামের স্থান।

কোনরকমে সেইখানেই ঢুকে পড়ে।

টিনের রংচটা সুটকেস আর তুরীর তৈরী কাঁথাটা নামাতেই একজন বুড়ো শীর্ণকায় লোক চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। তীব্র কর্কশ চাউনি। আপাদমস্তক দেখে চলেছে লোকটা,—হাড় পাঁজরা গুলো জিরজির করছে, গলায় মোটা একগাছা পৈতা।

আরুলাম্থান একটু বিব্রত বোধ করে—

একটু থাকবার জায়গা—

নিবাস? এত শীর্ণ চেহারা হতে এত মোটা কর্কশ গলা বের হবে আরুলাম্থান ভাবতেই পারেনি। হকচকিয়ে যায় সে। সামলে নিয়ে উত্তর দেয়—পাথরকুচি।

আপনারা?

জাতি এবং বংশপরিচয়ের প্রশ্ন উঠতেই বেশ বিব্রত বোধ করে আরুলাম্থান, দেবার মত পরিচয় ত কিছুই নাই! বলে ওঠে—

আমরা সাঁওতাল, সহরে এসেছি মিটিংএ। দুটোদিন থাকবো ওই সিঁড়ির নিচে।

ওখানে কাঠ-কয়লা রাখা হয়।

তা হোক, কয়লা-খাদেই আমরা মানুষ, কোন অসুবিধা হবে না।

লোকটার চাউনি যেন আরও তীব্র হয়ে ওঠে, বলে সে, হুঁ। খেতে দিতে পারি তোমাকে, থাকবার জায়গা দেবার উপায় নাই।

দাঁড়িয়ে থাকে আরুলাম্থান, লোকটা আবার জাবেদা খাতায় মন দেয়। বলে ওঠে আরুলাম্থান, যদি কোনরকম—

রকম-সকম সবই বললাম বাপু, পথ দেখ। ঝামেলায় পড়ব শেষকালে!

মোকাম সাকিম নাই, এসেছ কি মতলবে কে জানে—ওসব হুজ্জতি পোয়াতে পারব না বাবা, তুমি সটান পথ দেখ।

এরপর আর কথা চলে না।

জিনিষপত্রগুলো বগলদাবা করে আরুলাস্থান নেমে আসে পথে।

·· রাত্রি হয়ে গেছে। মফঃস্বল সহর, রাস্তাও নির্জন হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দুএকটা সাইকেল রিক্সা চড়াইএর ওদিক থেকে বেগে নেমে আসে। দু'চারজন কুলি মদ খেয়ে ময়লা কাপড় জড়িয়ে হৈ-চৈ করতে করতে চলে মাঝেমাঝে।

জীর্ণ কলারের পাশ দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া সূঁচের মত বিঁধছে, কোর্তাটাও ছিঁড়ে গেছে আরুলাস্থানের। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সারা শরীরে ছেয়ে আসছে ক্লান্তি। পকেটে হাত পুরে মনেমনেই পয়সার হিসাব করতে থাকে। আর ছয়টাকা ক আনা পকেটে আছে।

সামনেই একটা বারান্দায় উঠে বসে। কোন রকমে সেইখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দিতে হবে। ইতিপূর্বে তার মত হতভাগ্য কয়েকজনই দখল করে রয়েছে জায়গাটা, আপদমস্তক চট না হয় কাপড় মুড়ি দিয়েই তারা একবার নড়েচড়ে ওঠে, যেন নবাগতের আগমনে বেশ সুখী নয় তারা।

ফাঁক দেখে ছোট সতরঞ্চিখানা পাতবার ব্যবস্থা করে আরুলাস্থান, ওপাশের লোকটা সহসা গড়িয়ে এসে ফাঁকটুকু ভরাট করে দেয়। শোয়া আর হলনা আরুলাস্থানের। লোকটা ঘুমের ঘোরেই হাত পা ছুঁড়তে থাকে। সরে আসে আরুলাস্থান।

কোন রকমে দেওয়ালে পিঠ রেখে কাঁথাখানা মুড়ি দিয়ে টান হয়ে বসে চোখ বোজবার চেষ্টা করে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানেনা, ভোরের আলো আকাশ-কোলে

ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দিক দিগন্ত হতে কলের ভোঁ বাজতে শুরু করেছে। কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রির অন্ধকারেই চলেছে লোহা-কারখানার দিকে কুলিমজুর শ্রমিকের শোভাযাত্রা। ঝুড়ি কোদাল নিয়ে দলে দলে প্রবেশ করে মাটির অতলে, কেউ কেউ আবার টিকিট পাঞ্চ করিয়ে কারখানার গহ্বরে প্রবেশ করে। মুখর হয়ে ওঠে সারা সহর। ঝকঝকে নতুন গাড়ি দুএকখানা বাংলো থেকে বার হয়ে হর্ণের শব্দে সচল জন-স্রোত দ্বিধাবিভক্ত করে ছুটে চলে।

…নিজের চেহারার দিকে চাইলে নিজেরই হাসি পায়। দুটো দিনের ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে ওর সারা গায়ে।

মিটিংএ যোগ দিতেই লজ্জা বোধ করে। কিন্তু এ লজ্জা তাকে দূর করতেই হবে। এই ত তার প্রকৃত পরিচয়! মানুষ বলে দাবী তাদের নাই। এই পঙ্কিল জীবনযাত্রা, এই কষ্টক্লিষ্ট জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই সংগ্রাম তাদের। সারা কলিয়ারির কত শতশত শ্রমিকের মনের কথা বলবার জন্যই ত সে এসেছে, ছিন্ন বাস মলিন বেশ তার কাছে কোন লজ্জাই আনতে পারবেনা।

রাস্তার কলে মুখহাত ধুয়ে বার হল সে। সকালের আলোয় বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে সে পথ চলে। একটা মহান কর্তব্য-সাধনের ইঙ্গিত যেন সে পেয়েছে।

জীবনে এত লোকসমাগম দেখেনি আরুলাম্বান। সিনেমাহলের মধ্যে সভা হচ্ছে। এসেছে সাইকেল রিক্সাওয়ালা—বাস মটরের ক্লীনার ড্রাইভার, এসেছে মিউনিসিপ্যালিটির মেথর ধাঙড়, এসেছে লোহা-কারখানার রোজ-মজুরের দল, কলিয়ারি থেকে এসেছে মালকাটারা। তেল, কালি, কয়লার কালো কষ লাগানো পোষাক পরে তারা এসেছে।

দু'চার জন বক্তার পর আরুলাম্বানের পালা। পাথরকুচি মজুর-সভা

থেকে এসেছে শতশত শ্রমিকের বাণী নিয়ে, তাদের নির্বাক কণ্ঠের ভাষা নিয়ে।

সারা শরীরে কেমন একটা চাঞ্চল্য, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকে উষ্ণ রক্তস্রোত। মঞ্চের উপর দাঁড়াল আব্দুলাহ্বান। ছিন্ন বিবর্ণ পোযাক, সারা শরীরে ক্লান্তি ও ক্লিষ্টতার ছাপ ; পা দুটো যেন তার ভার বইতে পারছে না। স্তম্ভিত জনতার দিকে চেয়ে থাকে সে।

…চোখের সামনে ভেসে উঠে অতীতের কষ্টময় দিনগুলো…… বাঁশগড়া কলিয়ারির সেই কলেরা-রোগাক্রান্ত লোকটির ব্যাকুল মিনতিভরা চাহনি, তার অব্যক্ত ভাষা, বিধবা অনাথা মেঝেনের আর্তনাদ। মনে পড়ে পারমিট ম্যানেজারের মৃতদেহের পাশে আবৃত মৃত্যুকাতর মালকাটার রক্তাক্ত দেহটা, মনে পড়ে এমনিতর শত শত ঘটনা প্রতিদিন সে যা দেখে এসেছে, যার প্রতিবাদ করবার জন্য সারা মন তার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাথরকুচির ছোট সাহেবের জানোয়ারের মত মুখখানা…শক্ খেয়ে মৃত লোকটার নিথর দেহটা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। আজ তাদের সবার আত্মা যেন ব্যাকুল কণ্ঠে তাকে আবেদন জানায়…আমাদের না বলা কথা তুমি প্রকাশ করো মানুষের সামনে, সারা দেশকে শোনাও আমাদের জীবনের দুঃখ কষ্টের কাহিনী। তোমার কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠুক।

…জনতা বিচিত্র-দর্শন লোকটাকে মঞ্চের উপর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। চাপা গুনগুন শব্দ শোনা যায় চারিদিক থেকে।…আব্দুলাহ্বানের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

বন্ধুগণ, আমি এসেছি এমন একটা জায়গা থেকে যেখানকার কোন সংবাদই আপনাদের কাণে পৌছায় না। পৌছায় না তাদের কোন সংবাদ যারা বছরের পর বছর ধরে শোষণের চাকায় পিষে নিংড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, যাদের রক্তে কালো কয়লার রং বদলে গেল।

তাদের কাছ থেকে আমি নিয়ে এসেছি শত শত রিক্ত কাঙাল মনের প্রীতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

মুগ্ধ জনতা নির্বাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। আরুলাম্থান যেন পথ খুঁজে পেয়েছে, সাড়া জাগাতে পেরেছে জনতার আত্মায়। তার কণ্ঠস্বর গমগম করে।

…কি যেন একটা বিচিত্র অনুভূতি তার শরীরের প্রতিটি তন্ত্রীতে! কী দুর্বার প্রতিবাদের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে,…হেডউড থেকে শুরু করে তার জীবনে যারা এসেছে তাদের প্রকৃত রূপ যেন প্রকট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। দীর্ঘ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, পুঞ্জীভূত প্রতিবাদের গুঞ্জরণ আজ ভাষা পায়। বলিষ্ঠ দৃপ্তকণ্ঠে সে বর্ণনা করে যায় তার জীবনের দেখা ঘটনাগুলো—কী করে তিলে তিলে পলে পলে ওরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি কথা তার বাস্তবের রসে সঞ্জীবিত… প্রতিবাদের সুরে সুস্পষ্ট…আশার আলোয় রঞ্জিত!

…সারি সারি জনতার মুখ যেন মিলিয়ে একাকার হয়ে গেছে… ব্যষ্টি ছেড়ে সমগ্র যেন একটি পুঞ্জীভূত প্রতিরোধের গ্র্যানিট পর্বত। সেখানে তার একক কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

কতক্ষণ কেটে গেছে সময় জানেনা, মন্ত্রমুগ্ধ হলটার যেন সম্বিত ফিরে আসে আরুলাম্থানের বক্তব্য শেষ হবার কিছু পরে। হাততালির শব্দে প্রেক্ষাগৃহ আন্দোলিত হয়।

…মঞ্চ থেকে নেমে এলো আরুলাম্থান—জড়িয়ে ধরল কয়েকজন তাকে।

বেশ বলেছ ভাই!

কি বলেছে আরুলাম্থান জানে না। সারা গা ঘেমে উঠেছে এই শীতেও। শরীরের উষ্ণ রক্তস্রোত তখনও থামেনি।

হঠাৎ সম্পাদক এসে আরুলাম্থানকে বলে—

একবার এস ভাই, ওরা তোমাকে দেখতে চায় একবার।

দেখতে চায়, এঁ্যা! চমকে ওঠে সে। একরকম টেনেই নিয়ে গেল সে আরুলাস্থানকে। মঞ্চের উপর দাঁড়াতেই সমবেত জনতার হাততালির শব্দে সে অভিভূত হয়ে পড়ে। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে জনতাকে প্রণাম জানায় আরুলাস্থান। ও কোণ থেকে অতি উৎসাহে কে যেন মুখে আঙুল পুরে সিটি দিয়ে ওঠে।

রাত্রি বেশ হয়ে গেছে। যুদ্ধবিজয়ী সৈনিকের মত চলেছে আরু-লাস্থান। রাস্তা প্রায় জনহীন হয়ে এসেছে। সেই বারান্দাতেই আজও রাত কাটাতে হবে, কে জানে আর জায়গা আছে কিনা···মিটিংএর কথাগুলো মনে পড়ে—শ্রোতাদের চোখে মুখে একটা কাঠিন্যের ছাপ!

জারজ—নাম পরিচয়হীন একটা সাওতাল বৃহত্তম সমাজে তার অন্তরের কথা শোনাতে পেরেছে।···এইখানেই শেষ নয়, এইত শুরু তার পথ চলার।

এ্যাই!—চড়াইএর মুখে নেমে চলেছে, হঠাৎ কার ডাক শুনে ফিরে চাইল। কয়েকটা লোক তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

এই শালাই! ধর—ধর!

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না আরুলাস্থান। তারা এগিয়ে এসে ততক্ষণে ওর জীর্ণ কলারটা চেপে ধরেছে—

খুব ফাটাচ্ছিলি রে শালা! এইবার?

ছাড় আমাকে!

শুয়ারকা বাচ্চা! প্রচণ্ড একটা ঘুসির চোটে আরুলাস্থান ছিটকে পড়ে রাস্তায়। একটা লাথির আঘাতে আবার নুয়ে পড়ে, মোটা মত লোকটা টেনে তুলে আবার একটা ঘুসি কসিয়ে দেয়··· একটা শব্দ··· জিবে কেমন একটা নোন্তা স্বাদ ···

হঠাৎ একটা সাইকেল রিক্সা আসতেই লোকগুলো একটু সরে দাঁড়ায়। রিক্সাওয়ালা আরুলাস্থানের রক্তাক্ত দেহটা রিক্সাতে তুলে উৎরাইএর পথে প্রাণপণে চালাতে থাকে।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে না আরুলাস্থান। রিক্সাওয়ালা চীৎকার করে ওঠে—নামবেন না, ওরা মেরে ফেলবে! শক্ত করে রডটা ধরে বসে থাকুন।

চড়াইয়ে নিচের দিকে পূর্ণ বেগে সাইকেল রিক্সাখানা নেমে চলেছে। একটা সোডার বোতল রাস্তার অদূরে পড়ে সশব্দে ফেটে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। রিক্সাওয়ালা মাথা নিচু করে প্যাডেল করে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে একটা গ্যারেজের পিছনে এসে থামল তারা। রিক্সাওয়ালা আরুলাস্থানকে ধরে নামিয়ে নিয়ে যায় ভিতরে। কেরাসিন কুপির আলোতে দেখে, জামাটা ভিজে গেছে, নাকটা ফুলে উঠেছে অনেকখানি। সোডার বোতলের কাঁচে রিক্সাওয়ালা ছোকরার কপাল আর গালও কেটে ছড়ে গেছে। আরও কয়েকজন বার হয়ে আসে।

তাড়াতাড়ি করে গরম জল চাপায় উনুনে। ছোকরাটিই ন্যাকড়া দিয়ে আরুলাস্থানের সমস্ত রক্ত মুছে দেয়। অন্যজন আটার রুটি বানাতে বসে। মিটিংএ এসেছিল সবাই; সুতরাং আরুলাস্থানকে চিনতে তাদের দেরি হয় না। গজরাতে থাকে একজন—

শালারা যাবি একবার ওদিকে? গাড়ীটা বার করে নিই গ্যারেজ থেকে, পেট্রলও আছে। বেশ ঘা কতক দিয়ে সটান লম্বা দোব। শালারা, বাপের বেটা হোস্—সামনে আয়। তা নয় চোরের মত ছোট্লুকি কারবার। চল পাগ্লা—এই রবে!

দলবল তৈরি হয়ে যায় দেখতে দেখতে, ডাণ্ডা, মোটরের হ্যাণ্ডেল—

ভাঙা এ্যাক্সেল সবই বার হয়ে পড়ে; পশুপতি গাড়ি বার করতে যাচ্ছে, বাধা দেয় আরুলাম্বান,—

না, ও করোনা! মার দিয়ে ওরা আমাদের থামাতে পারবে না, অনর্থক একটা নোংরামি করো না। তারা জানে অন্যায় করছে—তাইত রাতের আঁধারে সহরের বাইরে গেছে তারা।

মনে মনে গজরায় পশুপতি—

ওদের জানেন না স্যার, ওরা হারামির জাত! টাকা খেয়ে এই মিটিং ভাঙবার কম চেষ্টা করেছিল? ডাণ্ডার চোটে ঠাণ্ডা করেছিল ওদের এই শম্মাই। দেখে লেবেন স্যার কুরুক্ষেত্ত বাঁধাব, কাল সকাল হোক একবার! পদ্দা গণশা কেলো—উ শালাদের দেখে নোব একহাত। আপনার গায়ে হাত তোলে—জানে না কারা পিছনে আছে!

গরম গরম রুটি মটরের ডাল আর ভেলিগুড়, আহারটা মন্দ হল না, সবচেয়ে আরামের হল শয়ন পর্বটা। একটা খাটিয়াতে দুখানা কম্বল চাপা দিয়ে সব ক্লান্তি যেন ভুলে গেল আরুলাম্বান। পশুপতি বলে ওঠে—

আমাদের মেসে আপনার অসুবিধে হলো স্যার। ওছাড়া খাওয়াও জোটে না আর শোবারও কষ্ট হচ্ছে, মশারি ত নাই! মাথাতক্ কম্বলটা ঢেকে লিবেন একটু—ব্যস্।

হাসে আরুলাম্বান—না না অসুবিধা কী ভাই! কাল ত একটা বারান্দাতে বসেই রাত কাটিয়েছি, আর দু আনার মুড়ি খেয়েছি।

একগাল হেসে পশুপতি বলে—তবেই আপনি আমাদের দলে হতে পারবেন স্যার!

স্যার বলাটা তার মুদ্রাদোষ।

ফুঁ দিয়ে পিদিমটা নিভিয়ে দেয় সে। নীরবতা ছেয়ে আসে অন্ধকার

টিনের শেডটাতে। খড়ের পাতা বিছানায় কম্বলের উপর দু একটা নাক ডাকতে শুরু করে।

শিউকিষণ আর সকলেই সেদিন ধাওড়ার বাইরে প্রায়ান্ধকার ঘরের ভিতর জটলা জমিয়েছে। হঠাৎ প্রবেশ করে গোবিন্দ মিস্ত্রী, এক আধটু লেখাপড়া করেছিল কবে কোন পাঠশালায় তার গল্প আজও করতে ছাড়ে না। সগর্বে প্রবেশ করে, হাতে তার একখানা ছোট মত খবরের কাগজ। সপ্তাহে একখানা করে বের হয় মহকুমা সহর থেকে।

এই দেখ শিউকিষণ, কি লিখেছে দেখ!

কি—কি লিখেছে?

উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সকলেই, গোবিন্দ বলে চলেছে—

হুঁ হুঁ বাবা, তখনই বলেছিলাম জাত কাঠ, বটে কি না বটে এবার দেখে লাও।

ধমক দিয়ে ওঠে নিতাই—পড় কেন্ কি লিখেছে!

গোবিন্দ একটা কেরাসিন কাঠের বাক্সের উপরে উঠে দাঁড়ায়। বানান করে পড়ে চলেছে শ্রমিকসভায় আরুলাস্থানের বক্তৃতা।

শিউকিষণ হাতে খইনি ডলছিল, ফেলে দিয়েই উঠে পড়ে—ক্যা লিখা হ্যায়?

মিটিং মে ভারি জোর বাত কিয়া হ্যায় আরুলাস্থান; সব্ সে আচ্ছা!

হ্যাঁ!···শিউকিষণের মুখে জয়ের হাসি। তার আবিষ্কার মিথ্যা হয় নি। সহরের মাঝে খুব নাম করেছে, ছাপা অক্ষরে নাম উঠেছে তাদের সমিতির—তাদেরই আরুলাস্থানের। এ যেন তাদেরই গর্ব!

গোবিন্দ সবটা বানান করেও পড়তে পারে না, বলে ওঠে—

ভারি ভারি কথা বলেছে কিন্তু হ্যাঁ। বাহা রে আরুলান্থান…বাঃ!

গোবিন্দ আবেগটা প্রকাশ করে হাত পা মাথা নেড়ে। ওর আনন্দ প্রকাশের মাত্রায় আর সকলেই অনুভব করে—হ্যাঁ, বিরাট একটা কিছু করেছে আরুলান্থান সেখানে গিয়ে।

তুরী টিনের মগে করে খানিকটা চা ভাগ করে দিচ্ছিল তাদের, হঠাৎ ওদের আনন্দ আর দাপাদাপিতে না হেসে পারে না; শিউকিষণ বিশাল ভুঁড়িটা বের করে শুঁটকো গোবিন্দকে জড়িয়ে ধরে নৃত্য করে চলেছে ওদের চীৎকারের মধ্যে। গোবিন্দর হাতে তালগোল পাকান কাগজখানা। ওদের হট্টগোলে ধাওড়ার ঘরখানা ভরে ওঠে।

মিঃ ডান্‌কানের ওখানে সেদিন পার্টিটাই যেন নষ্ট হয়ে গেল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে হেডউড সাহেবও আছে, কয়েকজন সাহেব… বড়বাবুরাও এসেছে। বাইরে বসে রয়েছে চাঁদ, ডজনখানেক তাজা মুরগী ভেট নিয়ে এসেছে।

সাপ্তাহিক কাগজখানা সেদিন বড়বাবুর চোখে পড়তেই সে ডান্‌কান সাহেবকে কথাটা বলে ফেলে—

Have you heard this name sir—Arulanthan ?

মিঃ ডান্‌কান ঠিকমত স্মরণ করতে পারে না। বলে ওঠে হেডউড সাহেব, **yes—I know the bugger.**

He is now a labour leader, sir !

What ! আঁৎকে ওঠে মিঃ ডান্‌কান !

—Leader sir, a learned Santhal !

Bloody bastard ! মিঃ হেডউড গজরাতে থাকে।

মিঃ ডান্‌কান বলে ওঠে—**Translate his speech Barababu, —I like to see it.**

মিঃ ডান্‌কান ব্যাপারটা অন্য চোখে দেখে। সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিত লোক, এবং সে যদি শ্রমিক বা তাদের জাতের দুঃখের কথা বৃহত্তর সমাজে প্রকাশ করতে থাকে—আজ না হোক চার মাস পরে সে তাদের ক্ষতিই করবে।

মিঃ হেডউড বলছে—তার পরিচয়!···

—**I see**! মিঃ ডানকান এতক্ষণে বুঝতে পারে লোকটাকে। শীর্ণ লম্বা চেহারা, চোখদুটো যেন জ্বলছে! মাঝে মাঝে তাকে দেখেছে সে; ঠিক সাধারণ মাঝিদের মত চালচলন কথাবার্তা ওর নয়। একটু যেন চিন্তিতই বোধ করে মিঃ ডান্‌কান। ইতিমধ্যে বড়বাবু কোন রকমে জবুথবু করে খানিকটা ইংরাজী তর্জমা করে এনেছে। ব্যগ্রভাবে মিঃ ডান্‌কান সেটা পড়তে থাকে। তার মুখের উপর ফুটে ওঠে একটা কঠিন ভাব!

Objectionable!

বড়বাবু বলে ওঠে—**yes sir, he is digging a hole in our back sir**!

মিঃ ডান্‌কান কথা বলল না, উঠে গিয়ে পাশের কামরা হতে ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগল। সারা মুখে চোখে একটা কঠিন ভাব।

চাঁদ এসব ব্যাপার কিছু টের পেল না, তবে বুঝল এইটুকু যে কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে কোনখানে।

আরুলাপ্পান সেদিন কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলেছে।

লোহার কারখানার শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক হরকিষণজীর কথা-গুলোতে সায় না দিয়ে পারে না।

আমরাই ভোটে দাঁড় করাবো আমাদের প্রার্থী ; আমাদের হয়ে লড়তে পারবে এমনি লোক আমরা পাঠাবো।

কিন্তু আমাদের ক্ষমতা কতটুকু ?

আরুলাপ্পান জবাব দেয়, সমস্ত সভ্য যদি তাদের ভোট ঠিকমত দেয়, আমরা সংখ্যায় ঠিক জিতব। আমরাও কম নই।

ওপাশ থেকে বিজনপুর কলিয়ারির সম্পাদক বলে ওঠে—কিন্তু মদ খাইয়ে আর সামান্য পয়সা দিয়ে ভোট কিনে নিলে ?

আরুলাপ্পান না বলে পারে না, আমরা যদি এটুকু বুঝতে না পারি তবে আমাদের কষ্ট ত কোনদিনই ঘুচবে না !

আরুলাপ্পান মনে মনে যোগ দেয়। তাদের এলাকায় মেম্বর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। যদি ঠিকমত বোঝাতে পারে সকলকে এর অর্থ, তাহলে হয়ত জয়লাভ করা অসম্ভব নয়। একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?

তিনদিনে সভার কাজ শেষ হয়েছে। ফিরে যাচ্ছে আরুলাপ্পান, যে মানুষটি এসেছিল আজ তিনদিনেই তার তিনবছরের অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। জেনেছে অনেক···দেখলও প্রচুর,—জেনে গেল সে একা নয়··· যতই গহন অরণ্যের অন্ধকারে বাস করুক না সে, তার অন্তরের আলোক কোন বৃহত্তর সমাজের প্রদীপশিখারই অংশ। সে স্ফুলিঙ্গ মাত্র, এবং একটি স্ফুলিঙ্গই একটা জনপদ মহানগর আলোকিত করে দিতে যথেষ্ট।

···সারা মনে অদম্য উৎসাহ। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, তার সামনের পথ, সবই যেন তার কাছে পরিচিত হয়ে গেছে। মাথা নীচু করে অজ্ঞাত অপরিচিতের মত প্রবেশ করেছিল সহরে, যাবার সময় ছিন্ন কোটের মধ্যে বুক টান করে মাথা উঁচু করে চলেছে আরুলাপ্পান।

ক্লীনার পশুপতি, রিক্সাওয়ালা সতীশ, মেসের বন্ধুরা অনেকেই এসেছে স্টেশনে। বলে পশুপতি—এদিকে এলে আমাদের মেসেই থাকতে হবে স্যার !

নিশ্চয় !

এদের প্রীতি আর স্নেহের বাঁধন একদিনেই আপন করে নিয়েছে তাকে।

ডুংরীর বুকে নেমে এসেছে রাত্রির নিথরতা। কেঁদ গাছের ঘন কালো পাতায় রাতের বাতাস দোল দিয়ে যায়, সোয়ীর চোখে ঘুম আসে না। শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি জেঁকে বসেছে চারিদিকে। খামারে সোনা ধানের স্তূপ।

ফুকন মাথা অবধি কাঁথাটা মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। হঠাৎ কার ধাক্কায় তার চমক ভাঙল। সোয়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধড়মড় করে উঠে বসে ফুকন—কি রে?

…ঘুম আসছে নাই! সোয়ীর কণ্ঠে ব্যাকুল আবেদনের সুর। ফুকন যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়—তাই বল, হিমের রাত মাথাটো ঢেকে শুয়ে পড় গা দেখ, ঘুম চোখ ছাপাই আসবেক।

সোয়ী বসল ফুকনের বিছানার পাশে। ফুকন সরে আসে, চোখে তার বিস্ময়ের দৃষ্টি! তুর কি হইচে বল দিকি?

জানি না! ফুকন—

ফুকন এ ডাকের অর্থ জানে। কত সোনালি চাঁদের জোছনামাখা মহুয়ার গন্ধবিধুর রাতে এমনি ডাক সে শুনেছে। এমনি ডাক তাকে আনমনা করে দিয়েছে কত বিদায়ী সন্ধ্যার অস্তরাগরঞ্জিত রক্তিম পাহাড়তলীর ঝর্ণার কোলে, এমনি ডাকই তাকে সব ভুলিয়ে গ্রাম ছেড়ে অজানা জগতে পাঠিয়েছিল।

শো গিয়ে যা সোয়ী।

সোয়ীর চোখে আজ যেন জ্বালা…বলে ওঠে সে—না না না। উসব আমি জানি না, মানব নাই। এমনি করে থাকার চেয়ে মরাই ভালো!

ফুকনের মনে চলেছে দুর্নিবার ঝড়। সোয়ী···আজ নিরাশ্রয় বুড়ো রাঙাসর্দারের বংশমর্যাদা,···অসহায় মেয়ের সমস্ত ভার তারই উপর। তার কণ্ঠস্বরে ব্যথা ফুটে বের হয়।

তার চেয়ে বল কাল না হয় চলেই যাবো এখান থেকে।

সোয়ী যেন খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আসে। রাতের বাতাস হু হু স্বরে মাতন তোলে কীচক বাঁশের বনে, বিচিত্র সুরলহরীর সৃষ্টি করে চলে। সোয়ী কাছে পৃথিবী আকাশ পাহাড় বন সব যেন ব্যথাবিদুর হয়ে আসে। বলে সে, যেতে তুকে কি বলেছি আমি ?

চারিদিক নীরব। কুয়াশা যেন জোছনার সঙ্গে মিশে গলে গলে পড়ছে মাটির বুকে। সোয়ী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল। ফুকন বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবতে থাকে আকাশ পাতাল।

···তাদের সমাজে সাঙ্গার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সোয়ীকে আজ সে চোখে ফুকন দেখেনি, কী করে এই সংস্কার সে মেনে নেবে !

বিছানায় সোয়ী কাঁদছে, কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে ওঠছে তার সারা দেহ।

পাথরকুচি কলিয়ারিতে পা দিয়েই আরুলাস্থান অনুভব করে, আবার সে যেন আপনার ঠাঁইএ ফিরে এসেছে। পুরুলিয়া ধানবাদ রোড থেকে সুঁড়িপথটা বেয়ে নেমে দশরথের চায়ের দোকানের মাচাতে বসল। দেখতে দেখতে রমনা, নামো ধাওড়ার লটবর, গদা অনেকেই জুটে যায়। শিউকিষণ ডিউটিতে, তাই আসতে পারেনি। গোলমাল মাথায় নিয়ে হাজির হয় গোবিন্দ। একেবারে জড়িয়ে ধরে আরুলাস্থানকে—

ভ্যালা মোর ভাইরে, মুখটা উজ্জ্বোল করে আইছিস মাইরি !

আরুলাস্থান চীৎকার করে—ছাড় ছাড়, পড়ে যাবো যে !

দলবদ্ধ হয়ে তারা এগিয়ে আসে নামো ধাওড়ার দিকে, আরুলাস্থানের

কাঁথা আর স্যুটকেস ওদের মাথায়। গোবিন্দ আরুলাম্বানের টুপিটা একটা লাঠির মাথায় চাপিয়ে আগে আগে আসছে। বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখতে বার হয়ে আসে মাঝি মেঝেন অনেকেই। তুরী ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বার হয়ে আসে সর্বাগ্রে।

ব্যাপারটা এত সহজে এত জয়ের আনন্দের মধ্যে মিটলনা। আরু-লাম্বান জানত এমনি একটি কিছু ঘটবে, এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানত সে জীবনে এই ঘটনাই ঘটে এসেছে এতকাল। তার জীবনেও এর পুনরাবৃত্তি মোটেই বিস্মিত করে নি তাকে, হতাশও করতে পারেনি। বরং তার মনে এনে দিয়েছিল দুর্বার সাহস, জয় করবার নেশা। ওই শোষণকারীর দল সারা পাথরকুচির মধ্যে অন্তত একজনের সন্ধান পেয়েছে যাকে তারা ভয় করে, সমীহ করে।

কাজ করতে গেছে পরদিনই 'এ' শি্ফ্টে, হাজরীবাবু তাকে খাতায় সই করতে দেয় না। ম্যানেজার সাহেব তাকে ডেকেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা না করে সই করা হবে না।

কেন ?

হাজরীবাবু বলেন, তা কী করে জানব বল। হুকুম দিয়েছেন, বললাম তোমাকে। আশেপাশে কয়েকজন মালকাটা মিস্ত্রী সকলেই বিস্মিত হয়ে যায়। ভিড় জমায় তারা। একটা চাপা কলরব ওঠে।

হেঁকে ওঠে আরুলাম্বান—

…কুছ নেহি। তুমলোগ কামমে যাও হাম আতা হ্যায়। এই মংলা, ভেলু, নাম্ নাম্ খাদে নাম্ তোরা। তার কথায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওরা কাজে যোগ দেয়, খাদে নামতে থাকে সকলেই। আরুলাম্বান কয়লার গুঁড়ো-ঢালা পথ বেয়ে ম্যানেজারের বাংলোর দিকে চলতে থাকে।

…ম্যানেজার সাহেব আরুলাম্বানকে দেখে উঠে আসেন, সবে ব্রেকফাস্ট শেষ করে পাইপটা ধরিয়ে আমেজ করে টানছিলেন। বাংলোর

বারান্দায় রেডিওটাতে বেজে চলেছে একটা বিদেশী সুর, মাউথ অরগ্যানের তীব্র শব্দ জায়লোফোনের সঙ্গে মিশে একটা বীভৎস রসের সৃষ্টি করেছে। সকালের সোনালী রোদ কয়লার ধোঁয়ায় বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। কর্ডরয়ের প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে নেমে আসে মিঃ হোমস্।...কটাশে চোখ দুটো পিট্ পিট্ করছে,...নেটিভ একজনকে প্রবেশ করতে দেখে বিশালকায় দুটো আলসেশিয়ান কুকুর দারুণ প্রভুভক্তির পরিচয় দিচ্ছে গাঁক-গাঁক শব্দে। রেডিওতো জাইলোফোন মাউথ অর্গ্যানের তাণ্ডব সুরলহরী, আর আলসেশিয়ানের চীৎকার সব কিছু মিলে বাংলোটাকে ভরিয়ে তুলেছে। দাঁড়াল আরুলাম্থান—

Good morning sir.

Mcrning: You absented yourself for four days without notice, and we have taken another man in your place. I'm sorry for you Arulanthan.

Is this the real cause of my dismissal?

মিঃ হোমস্ একটু বাঁকা চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে, এক মুখ ধোঁয়া বার করে...পাইপটা হাতে ঠুকতে ঠুকতে বলে, Yes!

আরুলাম্থান প্রতিবাদ করে ওঠে—

No! You people are too cowardly to tell the truth! I spoke at the meeting: that is why you drive me out on this pretext.

মিঃ হোমস্ চমকে ওঠেন আরুলাম্থানের কথায়। আরুলাম্থানের কোটরগত চোখ দুটো যেন জ্বলছে! সারা মনে তার জ্বালা—নিজের জন্য কোন চিন্তা তার নাই...এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করা দরকার। বলে চলেছে সে—

But you won't be able to suppress this mcvement!

বেশী কথা বলতে ইচ্ছে হয় না, আজ নিজেকে ধনকুবেরের চাকর ওই ম্যানেজার মিঃ হোম্‌সের চেয়ে অনেক বেশী উচ্চ মনে করে। মুখের উপর দাঁড়িয়ে আজ গালাগাল দিয়ে এলেও হোমস্ কিছু করতে পারত না, কারণ অন্তরে অন্তরে জানে ও অপরাধ করছে নিজের কাছে, সমাজের কাছে, দেশের কাছে।

তুরীর কানে কথাটা গেছে। সে আজকাল পাথরকুচি কলিয়ারিতে কাজ করছে কামিনের। রোজ পায় একটাকা তু আনা। কোনরকমে চালিয়ে নেয়। আরুলাম্বানের সাহায্যে তাদের দিনগুলো কাটছিল আগে, ছেলেটা বড় হওয়ার পর হতে আরুলাম্বানের সাহায্য সে আর নেয়নি, একটা কামিনের কাজ নিয়ে কোন রকমে দিন গুজরান করছে। কিন্তু একটি মানুষের কৃতজ্ঞতার ঋণ সে কোন দিনই শুধতে পারবে না, সে আরুলাম্বান। পুরুষ জাতিটার উপর জন্মেছিল তার বিজাতীয় ঘৃণা··· জীবনের প্রারম্ভে একজন পুরুষই তার জীবন, যৌবন, স্বপ্নরাঙা দিন সব ব্যর্থ করে দিয়েছে, অভিশাপে ভরে দিয়েছে তার সুন্দর সহজ জীবনযাত্রা। আর একজন পুরুষই দিলো তাকে আশ্রয় তার চরমতম বিপদে, দিলো সান্ত্বনা, তাকে বাচিয়ে তুললো আহার আশ্রয় দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর বুক থেকে। সেই থেকে একজন মানুষকেই চিনেছে তুরী, সে আরুলাম্বান। তাকে শ্রদ্ধা করে—নিজের সমস্ত কলঙ্কই তার কাছে বলেছে কিন্তু সে লজ্জায় নুইয়ে দেয় না তুরীকে।

মহানন্দে শিষ দিতে দিতে আরুলাম্বানকে আসতে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে যায় তুরী,—ওকে শিষ দিয়ে গান করতে বড় একটা দেখেনি, তাছাড়া কাজের সময় ওকে আসতে দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে যায়।

একি, কাজে যাও নি!

আর যাবো না।

ছুটি হইছে ? এগিয়ে যায় ডুরী।

আরুলাম্থানের কণ্ঠে পরিহাসের সুর—হ্যাঁ, একেবারে—একটু চা খাওয়াবি ? বাচ্চা কোথায় ?

কী হইছে তুমার বলত ?

জবাব। সাহেব ডেকে জবাব দিয়েছে। ব্যস, হাঁ করে দেখছিস কি—চা থাকে ত কর একটু।

ডুরী কেমন যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে, কোনরকমে উৎকণ্ঠা চেপে রেখে শালপাতার জ্বাল দিয়ে চা করতে যায়। দেখতে দেখতে সংবাদটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। শিউকিষণ নাইট-ডিউটি করে ঘুম থেকে উঠে কানে হলদে রং‌এর পৈতেটা জড়িয়ে লোটা হাতে যাচ্ছিল—পথে কথাটা শুনেই ফিরে আসে, সাগ্রহে এসে প্রশ্ন করে—

ক্যা আরুন ভাই ? ক্যা শুন্‌তা ? সাব্‌ তুম্‌কো বোলায়া ?

হাঁ—নোকরি খতম্‌ হো গয়া।

কেঁউ ?

এগিয়ে আসে আরুলাম্থান। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়।

ওদেরই ঘরে চাকরী করে ওদের বিরুদ্ধে কোন কথা আমার বলা চলবেনা! তাই আমিও ঠিক করেছি ওদের চাকরীও আর করব না।

চলেগা ক্যায়সে ?

সশব্দে হেসে ওঠে আরুলাম্থান। বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে শিউকিষণ। চাকরী গেছে বলে লোকটা হাসছে, পাগলই হয়ে গেলে নাকি !

জবাব দেয় আরুলাম্থান—

একটা লোকের খানাপিনা কোন রকমে মিলে যাবে ভাই! বরং এখন আমি কাজ করবার সময় পেয়েছি। কাজ তো করতেই হবে; তবে সে কাজ আমার একার জন্যে নয়, আমাদের সবার জন্যে।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে শিউকিষণ!

গোবিন্দ গদাই রমণ মুংলু ওভারম্যান সকলেই সংবাদটা পেয়ে যায়, বিনা নোটিশেই কাজ বন্ধ করে দেয় কলিয়ারির প্রায় চার পাঁচশো শ্রমিক! দুপুরের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের অফিস ভর্তি হয়ে যায়। রাস্তায় গেটের আশে-পাশে জটলা পাকায় মাঝি মেঝেন ওভ্যারমান সর্দার মিস্ত্রিরা। মিঃ হোমস্ জানলা থেকে দেখে একটু ঘাবড়েই ওঠে! চট্ করে লোকটাকে জবাব না দিয়ে দু'চারদিন পর দিলেই ভালো হত। লোকগুলো চীৎকার করে—ম্যানেজার সাবকো মাংতা হ্যায়!

বাংলোতে কয়েকজন বাড়তি দ্বারোয়ানকে আসতে ফোন করে দিয়ে ম্যানেজার সাহেব উঁকি-ঝুঁকি মারেন। এসময় একা বেরোনো হয়ত ঠিক হবে না। বলিষ্ঠ লোকগুলো গাঁইতি-সাবল নিয়েই খাদ থেকে উঠে এসেছে, মিস্ত্রীদের হাতে হাতুড়িও না থাকার কথা নয়।

আরুলাম্বান কি সব লিখে চলেছে। সংবাদটা সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে পাঠান দরকার তারই খসড়া করছে, হঠাৎ একটা চাপা গণ্ডগোল শুনে বাইরে আসে। উৎরাইএর ওপাশ থেকে ম্যানেজারের অফিসের দিক হতেই সাড়া উঠছে। বনতুলসীর জঙ্গল ভেদ করেই ছুটে চলে সে। কে জানে কী ব্যাপার ঘটেছে সেখানে! চড়াইএর মাথা হতে দেখতে পায়, মালকাটার জনতা ঘিরে রয়েছে অফিসটাকে। ম্যানেজারের বাঙ্লো থেকে কজন দ্বারোয়ান বন্দুক নিয়েই ছুটছে সে দিকে। গণ্ডগোল পাকাতে দেরি হবে না, ওরাও গুলিই চালাবে, নিহত আহত হবে কয়েকজন।

আরুলাপ্পানকে আসতে দেখে উত্তেজিত জনতা শান্ত হয়ে আসে। ভিড় ঠেলে অফিসের দাওয়াতে দাঁড়াল সে।

কী হয়েছে ?

এগিয়ে আসে গোবিন্দ, চীৎকার করে ওঠে,

এর জবাব চাই। কেন বিনা কারণে তোমাকে বরখাস্ত করবে ?

দোষ আমারই ছিল, দরখাস্ত না দিয়ে ছুটি মঞ্জুর না করিয়ে যেতে হয়েছিল আমাকে, কোম্পানি সেই কারণেই জবাব দিয়েছে।

চীৎকার করে ওঠে গোবিন্দ—মিছে কথা !

আমি মিছে কথা বলতে আসিনি গোবিন্দ ! এখানে গণ্ডগোল করো না, ওরা গুলি চালাতেও কসুর করবে না। নিজের নিজের কাজে যাও, আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের ধাওড়াতে আসবে, যা বলবার আমি বলব। যাও, যাও তোমরা এখান থেকে।

জনতা ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করে। ক্রমশঃ প্রায় সকলেই চলে যায় অফিস থেকে। নেমে আসছে আরুলাপ্পান, হঠাৎ পিছনে ডাক শুনে ফিরে চাইল। মিঃ হোমস্ ডাকছে তাকে।

Good day, sir !

এগিয়ে আসে মিঃ হোমস্, একেবারে আরুলাপ্পানের কাঁধে হাত রেখে তার দিকে তাকায়। কপিশ চোখে যেন একটু অন্যরকম দৃষ্টি। আরুলাপ্পানও বেশ আশ্চর্য হয়ে যায়।

সাহেব যেন কি বলতে গিয়ে বলতে পারে না, ওর চোখের দৃষ্টি আর স্পর্শের মধ্যে এইটুকু পরিচয় পায় আরুলাপ্পান, যে লোকটা নিজের ইচ্ছাতে এসব করেনি। মালিক বা অন্য কারো ইঙ্গিতেই তাকে এই কাজ করতে হয়েছে।

Thank you sir !

কোন রকমে সাহেবের এই অপ্রস্তুত অবস্থাটা আরুলাপ্পানই কাটিয়ে

দিয়ে নেমে আসে। গেটের বাইরে অনেক দূরে এসেও দেখে, সাহেব তখনও তাকিয়ে রয়েছে তার গতিপথের দিকে।

দুপুরের রোদে লাল সুরকি-ঢালা পথের দুপাশে কয়েকটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের শ্বেত আভা, বনের বুকে ডালিয়া সিজন-ফুলের বর্ণ বৈচিত্র্য,—সব কিছু মিশে কেমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করে। আরুলাম্বান চিন্তিত মনে ধাওড়ায় ফিরে আসে।

সামনে তার বহু বাধাকীর্ণ দুঃখের ক্ষুরধার দুর্গম পথ, এই পথে তাকে চলতে হবে।

জয় হতে পারে না হতেও পারে, তবু বাঁচবার দাবীর জন্য যারা যুদ্ধ করে যাবে···আরুলাম্বান থাকবে তাদেরই দলে।

হঠাৎ এত খাতির, সম্মান ভালোবাসার কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না চাঁদমাঝি। তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মিঃ ডান্‌কান, আরও অনেক কলিয়ারির সাহেব, বরাকরের সূরযপ্রসাদ বাবু, হেডউড সাহেব সকলে মিলে কত কথা শোনায়!

চাঁদ ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। ডুংরী থেকে সেজেগুজেই বেরিয়েছিল একটু; সুন্দর মাঝি দেখে ছেলেকে ঘোড়া নিয়ে বার হয়ে যেতে। সোয়ী চলে যাবার পর থেকে ছেলেকে বিশেষ কিছু বলত না, আজও বলে না।

বাংলোতে বসে চাঁদ সাহেবদের সামনে কখনও মদ খায় নি, আজও খেতে চায় না। সূরযপ্রসাদ বাবু নাক টিপে ধরে ডান হাতে গেলাসটা তুলে মুখ বিকৃত করে এক এক ঢোক গেলাবার চেষ্টা করছে। টুপিটা টেবিলে নামানো। মাথার শিখাটার প্রান্তে একটা গিঁট বাঁধা, কপালের সাদা চন্দনের ছাপ মুছে যায় নি তখনও।

বলে ওঠে আরে চাঁদ আজ থেকে দোস্ত হলে কিনা,—কেউকেটা হয়ে গেছ দেখবে এইবার তুমি—সমঝা ?

চাঁদ মাথা নাড়ে। কোনরকমে গিলে ফেলে—মন্দ নয়! দেশী মদের এত ঝাঁঝ নাই সত্যি, আর গন্ধটাও বেশ লাগে! সাহেব তাকে বুঝিয়ে চলেছে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।

আদিবাসীদের পক্ষ থেকে প্রার্থী দাঁড় করানোর ব্যাপারে কলিয়ারি ম্যানেজার মালিকরা সকলেই যেন মেতে উঠেছে। সময় আর নাই। তাই,—যে চাঁদমাঝি বাংলোর গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বাবুর্চির হাতে ঠ্যাংএ দড়ি-বাঁধা মুরগীগুলো দিয়ে সেলাম করত, সেই চাঁদ আজ সাহেবের খাসকামরায় ঢুকেছে, শুধু তাই নয় একসঙ্গে পেগ চালাচ্ছে অবলীলাক্রমে।

ব্যাপারটা কিছু বুঝুক না বুঝুক চাঁদ এইটুকু বুঝেছে, সাহেবদের তাকে দরকার। এই ফাঁকে তার যদি কিছু আসে আসুক না!

সুরযপ্রসাদ বাবু তাকে ইলেকশন এবং আনুসঙ্গিক ব্যাপারটা বুঝিয়ে চলেছে। তোমার ধাওড়া, আশপাশের সমস্ত সাঁওতাল ওঁরাও—মালকাটা সবাই তোমাকে ভোট দেবে। তুমিই হবে তাদের—নেতা। নেতা কথাটার অর্থ করে দেয় সুরযবাবু—

এই, তোমার বাতে উ সব উঠবে বসবে।

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে চাঁদ।

সেইখানেই আলোচনা হয়ে যায় আগামী সপ্তাহের কর্মসূচি। মিঃ ডান্‌কান, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আরও কয়েকজন মিলে একটা খসড়া করে দেয় বড়বাবুকে, ইতিমধ্যে বাংলা তর্জমা করে ছাপাখানায় দেবার জন্য। চাঁদকে নিয়ে রীতিমত ভাবেই তারা উঠে পড়ে লাগে। চাঁদ অনুভব করে, রাতারাতি তার দাম নিশ্চয়ই বেড়ে গেছে।

বুক ফুলিয়ে ডুংরীর দিকে পা বাড়ায় চাঁদ।

সুন্দর মাঝি এসবের কিছু বোঝে না, তাদের জীবনে এসব কখনও ঘটেনি! চাঁদ নাকি সহরে গিয়ে ভদ্রলোকদের সঙ্গে চেয়ারে বসবে; রাস্তা-ঘাট, ডাক্তারখানা তৈরী করবে, সাঁওতাল জাতের মাথা হবে। ঠিক এতটা ভাগ্য বিশ্বাস করতে পারে না বুড়ো, আপন মনে গজগজ করে।

বুড়ী মেঝেন বলে ওঠে, বুললাম তুকে বিহা দে উয়ার, তা লয় তুর হুঁস হবেক নাই, ইখন ইমনটি হবেকই তো!

সমস্ত ডুংরীতে ডুংরীতে চলেছে জল্পনা-কল্পনা, সহরে যাতায়াত যাদের এক আধটু আছে তারা গল্প জমায়। সন্ধ্যা নেমে আসে ডুংরীর বুকে, পাহাড়ের কালো মাথায় মাথায় তারার দল উঁকি মারতে থাকে, তাদের গল্প জমে ওঠে।

ইবার সাঁওতালদের জন্যে হবেক ইস্কুল—ডাক্তারখানা; সরকারী ডাক্তার আসবেন, সবাইকে পড়তে হবেক—আর বনে বাদাড়ে ঘুরে শজারু খরগোস মারলে চলবেক নাই। ওদের দুঃখ ঘুচবে, অনাহারে বিনা চিকিৎসায় কেউ মরবে না, ওদের সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফসল বনবরাতে নষ্ট করে দেবে না, তারই ব্যবস্থা করবে—এই প্রতিশ্রুতি দিতেই চাঁদ এসেছে।

ডুংরীর মাঠটা ছেয়ে গেছে লোকে। সাহেবদের লোকজন এসে বিলিয়ে যাবে প্যালুড্রিন। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আসে কাঁচের মালা—শস্তা লজেন্স; একজন লোক চীৎকার করে চলেছে; চাঁদ আরও দু'একজন লোক, একজন সাহেবও আছে, তারা বসে রয়েছে উঁচু টিবিটার উপর। লোকটার কথা তারা বুঝতে পারে না, তবে লোকটাকে চিনতে পারে। বরাকরের ধানকলের মালিক সুরযবাবু।

ফুকন বলে ওঠে—হ দেখ উই লোকটাই বটে, আমাদের আঠার মন ধানের দাম বিবাক দেয় নি, বললেক, উ ধান তুদের লয়!

যোগান দেয় আর একজন মাঝি—উ শালা অমনি বটে রে, আমার সিবার দুগণ্ডা তিনটো টাকা হাঁকাই দিলেক, বুললেক—টিপছাপ দিয়ে সব লিয়ে গেছিস তুর টাকা।

প্রকাশ্য চুরির সংখ্যা সূরযপ্রসাদের এমনিতর খুঁজলে হয়ত অনেক পাওয়া যাবে, তার চেয়ে বড় ফাঁকিগুলোর সংবাদ এরা জানে না। তবু সাঁওতাল জাত একবার যার উপর বিশ্বাস হারায় তাকে বিশ্বাস করতে পারে না সহজে। প্রথমেই যাকে বিশ্বাস করে···তাকে অবিশ্বাস করতেও চায় না সহজে তারা।

সূরযপ্রসাদ বর্ণনা করে চলেছে ওদের দুঃখের জীবন—যেদিন খাটতে যাও সেইদিন তুমাদের খাবার জোটে, আর যেদিন যেতে পার না, শিকারও জোটে না—সেদিন দিতে হয় উপোস।

আজ তোমাদের দাবী সমস্ত মেটাতে পারবে তোমরা। চাঁদমাঝিকে তোমরা ভোট দাও। ওই হবে তোমাদের একমাত্র বন্ধু!

চীৎকার করে উঠে একজন—উকে আমরা মানবো নাই, উ আমাদের কেউ লয়!

থেমে যায় সূরযপ্রসাদ! বিনা প্রতিবাদে এতক্ষণ সমস্ত ভূমিকাই তারা সহ্য করে এসেছে, হঠাৎ চাঁদের নাম উঠতেই বাধা পড়ে।

কে···তোমার অভিযোগ আছে?

অভিযোগকারী উঠে দাঁড়াল না, জানালও না তার অভিযোগ; কিন্তু একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি ছেয়ে ফেলে চারিদিক। কোন রকমে সূরযপ্রসাদ তার শ কয়েক ইস্তাহার বিলি করে সদলবলে অন্যত্র প্রস্থান করে।

অভিযোগকারীকে আর কেউ না দেখলেও দেখেছিল চাঁদ। ভাল করেই চেনে তাকে। ব্যক্তিগত জীবনে চাঁদ তাকে বঞ্চিত করেছিল একদিন, কিন্তু পাকচক্রে আজ পরাজিতই হল তার কাছে। আজ তার

প্রতিবাদ শুনে খানিকটা ঘাবড়েই গেছে। প্রকাশ করেনা কিছু, মনে মনে গজরাতে থাকে।

ব্যাপারটা ভাল ভাবে টের পায় না ফুকন, অন্যান্য মাঝিরাও। তবে কিছু একটা গোলমাল আছে অনুমান করে। সাঁওতাল জাতের মাথা হবে, তার জন্য সাঁওতালদের সাতাশী আছে তাদের সমাজ আছে, সেখান থেকে তারা লোক পাঠাবে যাকে সমস্ত সাঁওতাল ওঁরাওরা মান্য করে, যে ভালবাসে সমস্ত সাঁওতাল ওঁরাওদের। তা নয়, চাঁদকে কেন তারা মাথা করতে যাবে!

চাঁদের পরিচয় ফুকন ভালভাবে জানে, জানে সমস্ত ডুংরীর লোক; আহেরিয়া শিকারের শিকার তাদের সে কেড়ে নিয়েছে। বৎসরের একটি দিনে তাদেরই একজনকে যারা পশুর মত গুলি করে মেরেছে চাঁদ তাদেরই দলে। চাঁদকে তারা ক্ষমা করবে না, করতে পারে না। চাঁদের হাতে তারা কোন ক্ষমতাই তুলে দেবে না। দলে দলে মাঝি মেঝেনদের সে বিক্রি করেছে ওদের চিনকুঠিতে খাটবার জন্য।

ফুকনের কথায় ডুংরীর সকল সাঁওতালই মাথা নাড়ে। বুড়োরা বলে ওঠে, হুঁ কি? আমাদের ভালোমন্দ বলবার থাকে, সাতাশীর সর্দার বলবেক। উর কথা আমরা মানব নাই।

বলে ওঠে সারণ মাঝি—আহেরিয়া শিকেরের দিন ভিনলুক ঢুকালেক বনে, গুলাই মেরে দিলেক বিবাক, আবার ভিনলোক লিয়ে আইছে উয়ার সাফাই গাইতে! লাজ নাই ওটোর!

সুন্দর মাঝি চাঁদকে গালাগাল দেয়; সত্যিই দুটো পয়সা হওয়ার পর থেকে চাঁদ বদলে গেছে। সমাজের—সাতাশীর কাউকে মাথা নোয়ায় না, উঠা-বসাও করেনা এদের সঙ্গে। আজ দরদের কথা বললে চটাই স্বাভাবিক। চাঁদের এই নির্লজ্জ আত্মপ্রচারে লজ্জায় তারই মাথা নুয়ে আসে!

কিন্তু এমনি করে ডুংরীতে দাঁড়িয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দল পাকালেই চলবেনা। চাঁদকে পেরে উঠবে না ওরা। কলিয়ারির ম্যানেজার, ধানকলওয়ালা সুরযপ্রসাদ বাবু পয়সা দিয়ে—সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করবে ওকে, ওদের শক্তির কাছে এরা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আর চাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, এমন লোকও সাঁওতাল ওঁরাও জাতের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর।

সোয়ীও শুনেছে কথাগুলো। মনে মনে চাঁদকে ঘৃণা করে সে, কোনদিনই সে তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে তুরীর ব্যথা-কাতর মুখখানা,—নিরপরাধ একটি মেয়ে, কে জানে বেঁচে আছে কি নাই সে! থাকলেও ব্যর্থ জীবনের গ্লানিতে তার জীবন কালো হয়ে গেছে। আজ সেই চাঁদ আবার বৃহত্তর কোনো ক্ষমতা হাতে পেলে তাকেও নিষ্কৃতি দেবেনা। এই অপমানের শোধ তুলবেই।

তুরা কী করলি?

কী আর করব বল্। জবাব দেয় ফুকন চিন্তিত ভাবে।

চোখের উপর দেখবে এমনি অবিচার চলছে, বিনা প্রতিবাদে তারা বসে থাকবে কতকাল!

…আরুলাম্বানের মনে আজ মুক্তির নেশা। কোন বাঁধন নাই, বিরাট বিশ্বে আবার সেই জীবনের পরিক্রমা।

…কিন্তু এবার সে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে, খুঁজে পেয়েছে তার জীবনের কর্মপন্থা। বনতুলসীর জঙ্গলে ঢাকা মৃত্তিকা…পাহাড় শালবনের সীমারেখা ঘেরা পৃথিবী…কালো মসীমাখা আকাশ—সব কিছুর অন্তরালে ছড়িয়ে রয়েছে মূর্তিমান প্রতিরোধ, সমস্ত শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বৃহত্তর প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলবে সে।

…দুপুর বেলায় সেদিন লৌহ-সহরে প্রবেশ করল। বিরাট লোহার

কারখানা সারা সহরটাকে জুড়ে রয়েছে, তারই প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সহরটা। সাজিয়ে তুলেছে তাকে মালিকের মনোমত করে। সাজান বাংলো···ঝিজন ফুলের কেয়ারী করা লন, রেডিওর এরিয়েল···বাতাসের দোলা···এ্যাশফ্যাল্‌টের রাস্তার উপর দিয়ে মস্‌ণ গতিতে ঢালু চড়াইএর আড়ালে মিলিয়ে যায় নতুন মডেল অস্টিন, শেভ্রলে বুইক গাড়ির দল। অফিসার ইঞ্জিনিয়ার ফোরম্যানের পদমর্যাদা বোঝা যায় এ-বি-সি টাইপ বাংলো আর গাড়ির মেকার দেখে। সোঁদল গাছে এসেছে থলো থলো হলদে ফুলের প্রাচুর্য, ওদিকে একটা রাস্তার দুপাশে কেবল কলকে ফুলের মেলা। স্বপ্নপুরীর নিথরতা ভেদ করে কানে আসে বয়লার ব্লাস্টফার্ণেসের তীব্র শব্দ। সমস্ত কিছু ভেদ করে কানে আসে কারখানার ভোঁ-র শব্দ।

দিক্‌বিদিক্‌ প্রকম্পিত করে আর্তনাদ করে চলেছে ভোঁ-টা। দেখতে দেখতে সুন্দর স্বপ্নপুরীর সবুজ গাছঢাকা পথগুলো ভরে ওঠে কালো এ্যাপ্রন পরা কয়লা-তেলমাখা শ্রমিকের জনতায়—যেন স্বপ্নপুরীতে নেহাৎ অবাঞ্ছিত তারা, এখানকার সৌন্দর্যের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। তেলকালিমাখা ভারী বুটের শব্দে রাস্তা ভরে ওঠে।

গেটের বাইরে আরুলাম্বানকে দেখতে পেয়ে বেণীপ্রসাদ ছুটে আসে। জড়িয়ে ধরে তাকে—তুমি!

আরুলাম্বান হাসে—হ্যাঁ চাকরি ত আর করছি না, তাই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি চারিদিক।

চল আমার ওখানেই কথাবার্তা হবে।

পরম সমাদরে তাকে নিয়ে গেল বেণীপ্রসাদ।

শ্রমিক সভার একজন বিশিষ্ট কর্মী, আজকের দুনিয়ার খবর কিছু কিছু রাখে। সুতরাং আশেপাশের সমস্ত সংবাদই তার জানা।

বরাকর এবং ওদিককার আদিবাসীদের মধ্য থেকে ইতিমধ্যে গুঞ্জন শোনা গেছে—চাঁদমাঝিকে তারা ঠিক পছন্দ করে না।

নামটা শুনে একটু চমকে ওঠে আরুনাস্থান।

পাহাড়তলীর চাঁদমাঝি, সুন্দর মাঝির ছেলে?

হ্যাঁ, চেন নাকি তাকে?

চেনে না? খুব চেনে আরুলাস্থান, কিন্তু এত শীঘ্র সে যে মালিক প্রভুদের দয়ায় ইলে্কশনে পর্যন্ত দাঁড়াবার বরাত করেছে তা জানত না, শুনে তাই প্রথমে বিস্মিতই হয়েছিল।

...লক্ষ্য করে আসছে এমনি করেই সমস্ত প্রতিরোধের শক্তিকে ওরা বানচাল করে দেবে। চাঁদ যদি সত্যিই মনোনীত হয়, সাঁওতাল ওঁরাও জাতের বাসস্থানের কোন উন্নতি হবে কিনা—তাদের জীবনযাত্রার মান কিছু উন্নত হবে কি না পরের কথা, তবে মিঃ ডান্‌কান প্রমুখ বিদেশীর কলিয়ারিতে মালকাটার অভাব হবে না, ওদের প্রতিপত্তিও কোনদিন ক্ষুণ্ণ হবে না।

কী ভাবছ তুমি?

বেণীপ্রসাদের কথায় আরুলাস্থানের চমক ভাঙে। ফুলডুংরী পাহাড়তলী ও অঞ্চল সব তার চেনা, জীবনের কুড়িটা বছর কেটেছে ওদের মধ্যে। ওর শ্যামলিমায় সে মানুষ হয়ে উঠেছে, ওই ডুংরীতেই জন্মেছিল তার মা। মাকে তার মনে পড়ে না! বোধ হয় কালো নিটোল গড়নের, ঠিক শালগাছের মত প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়েই বড় হয়ে উঠেছিল সে। বনে বনে গাছকোমর করে সেও ছুটোছুটি করত।...

মাকে তার মনে পড়ে না...মনে পড়ে কাঁইজোড়ের ছায়াঘন নদীতীর, নীল রৌদ্রছায়ার মেখলা পরা পাহাড়সীমা, সবুজ বনভূমি।

বেণীপ্রসাদ আরুলাস্থানের নীরবতায় বিস্মিত হয়ে যায়। বলে, আরুলাস্থান, কেউ প্রতিবাদ করে নি?

করেছে বৈকি। তবে জানো ত, ফুলডুংরীর দুচারজন সেদিন মীটিংএ গোলমাল করেছিল বটে, তবে তেমন লোক কেউ নাই।

বেণীপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে যায় আক্লাস্থানের কথায়—

তোমার মায়ের বাসা ছিল ওই ডুংরীতে ?

হ্যাঁ আমিও বড় হয়েছি ওইখানেই, চিনিও ওদের।

তবে তুমিই দাঁড়াও আক্লাস্থান, আমরা তোমার জন্য চেষ্টা করব, টাকাকড়িও তুলতে পারব কিছু। লোকজনও যাবে।

প্রথমটা আক্লাস্থান চমকে ওঠে,—ইলেকশনে দাঁড়াবার মত সামর্থ্য বা সাহস কোনটাই তার নাই। কিন্তু চাঁদকে, ওই মালিক ম্যানেজার কল মালিকদের জানিয়ে দিতে হবে যে ওদের মতই চূড়ান্ত নয়।

একটু ভেবে দেখি বেণী।

রাত্রি ঘনিয়ে আসে। সারা বিনিদ্র সহরের বুকে একটা দৈত্য যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে বিকট শব্দে। ব্লাস্ট-ফার্নেসগুলোয় কাজ চলছে। জনহীন পথে আলোগুলো নীরব প্রহরার মত মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাতের বাতাসে একটানা আর্তনাদের মত শোনা যায়। ধোঁয়ার সঙ্গে কুয়াসা মিশে জমাট আস্তানা পাকিয়েছে সহরের মাথার আকাশে।

...আক্লাস্থানের ঘুম আসে না। সারা মনে চিন্তার জাল বোনা চলে। এতবড় একটা শ্রমিক সঙ্ঘ, আশেপাশের কলিয়ারির অনেকেই তাকে সাহায্য করবে। একটা যোগ্য লোকও যদি মনোনীত হয় কেন সে নামবে না ?

...সারা মনে একটা প্রবল ব্যাকুলতা। যে মাটি তাকে মানুষ করে তুলল, যাদের জন্য সে আজ ঘরছাড়া, যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে আজ ছন্নছাড়া, সেই দুর্বার প্রতিরোধের এই আহ্বান সে তুচ্ছ করতে পারবে না। সাড়া তাকে দিতেই হবে।

জয় হোক পরাজয় হোক ক্ষতি নাই, তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলবেই সে। কেউ তাকে থামাতে পারবে না, তার কণ্ঠস্বর কেউ দাবাতে পারবে না।

এতদিনের অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে···এই মূক জনগণ আর অশিক্ষিত শ্রমিকদের মধ্যে একটা ঐক্য আছে, একটা প্রাণের মিল আছে। আর আছে টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত কর্মপ্রাণ,···সেগুলো একত্রীভূত হলে সুপ্ত দানবের ঘুম ভাঙবে।

···রাতের অন্ধকার গলিত লোহার স্রাবে অগ্নিস্নাত হয়ে উঠেছে। লোহা, পাথর, কয়লা, চূণাপাথর আগুনের তাপে গলিত তরল হয়ে সৃষ্টি করছে জগতের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শক্তিশালী বস্তু।

তেমনি বনের পাথরের মত শক্ত মানুষও তার মনের উত্তাপ দিয়ে অমনি লৌহমানব সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবে। কে জানে তার তপস্যা কোনদিন সফল হবে কি না!

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে।···পূর্বদিগন্তে দেখা দেয় সূর্যের লালিমা, বার হয়ে আসে আরুলাম্বান। কুহেলিকা উদ্‌ঘাটন করে পূর্বসীমান্তে সূর্যের প্রথম প্রকাশ-মুহূর্ত।

শ্লাগের স্তূপে তখনও গন্‌গন্‌ করছে চাপড়া ঝামাপাথরের আগুন, রক্তরঙে ছেয়ে গেছে সারা সহর।

আজ আরুলাম্বানের মনে জন্ম নিল নতুন মানুষ একটি অমনি অগ্নিস্নানে শুদ্ধ হয়ে।

ডুংরীর সকলেই আশ্চর্য হয়ে যায়। ফুকনের মনে জাগে আশার আলো, সোয়ীর বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটেনা; আরুলাম্বান ফিরে এসেছে। এতদিন কোথায় ছিল জানে না তবে দুচারজন

শুনেছে সে একজন মস্ত লোক হয়ে উঠেছে। ফুকনই অভ্যর্থনা জানাল তাকে।

বেণীপ্রসাদ আর তুচারজন লোকজন যাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সে তারাও বিস্মিত হয়ে যায়। আরুলাম্থানকেই যেন আশা করেছিল এরা। সোয়ী ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে চিড়ে-তুধ বার করে দেয়।

আরুলাম্থান গোটাকয়েক চিঠি লিখে মহকুমা সহরে দিয়ে দিল। কাগজে যেন এটা প্রকাশ করে তারা। বেণীপ্রসাদ ঘাড় নাড়ে, সব ঠিক হয়ে যাবে আরুলাম্থান। আমরা আশেপাশের কলিয়ারিতেও লোক পাঠাব। তুমি এদিক দেখ, ওদিকের ভার আমরা নিলাম।

সেদিন বিকালেই ফুলপাগাড়ির ডুংরীতে সাতাশীর বৈঠক বসাবার ব্যবস্থা করতে ছুটল ফুকন।

একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায় সারা অঞ্চলে।

মিঃ ডান্‌কানের ইলেকশনী অফিস বসেছে মিঠা-তালার হাটে সুরযপ্রসাদবাবুর গম-সরষে-কুমড়োর গুদামের পাশে। হেডউড সাহেবও ছিল। কয়েকজন লোক কাজে ব্যস্ত। ইস্তাহার বিলি করা, প্যাম্পলেট লাগান, মাঝে মাঝে ধানকলে অবসর মত যাওয়া, লরী হাঁকিয়ে বিভিন্ন হাটে ডুংরীতে চীৎকার করে চাঁদের জয়গান করাই তাদের কাজ। আর সময় অসময়ে পুন্ন হালুয়াইএর দোকান হতে আসে হিঙের কচুরি আর চা। বাবুরা এলে মাঝে মাঝে আসে শোন হালুয়া খাস্তা কচুরি ইত্যাদি। হাটবারের দিন সারা হাট তারাই মাতিয়ে রাখে।

সেদিন সুরযপ্রসাদ চটেমটে অফিসে ঢোকে, হাতে তার সাপ্তাহিক কাগজ একখানা। মোটা মোটা রেখায় ছাপা হয়েছে তাতে আরুলাম্থানের ছবি,—শ্রমিক নেতা বলে সম্বর্ধিত করা হয়েছে আর কতকগুলো পোস্টার লালকালিতে মোটা মোটা অক্ষরে ছাপান···

আমরা চাই আমাদের নেতা !

এ সব কী ? সুরযপ্রসাদবাবু কয়েকদিন ধরে সংগ্রহ করেছে এই সব। তার প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে যায় কর্মীরা !

শুনেছিলাম বটে আরুলাস্থান দাঁড়াচ্ছে। এসব করছে কারা ? এই পোস্টার···ইস্তাহার বিলি ?

জানি না, তবে ওদের লোকই হবে।

গর্জন করে ওঠে সুরযপ্রসাদবাবু, সেটা ভি হামিও সমঝে।

রাগলে তার মুখ দিয়ে মাতৃভাষাটাই বার হয়ে আসে। তর্জনগর্জন করতে থাকে—এখানে কেউ এদের ইস্তাহার পোস্টার ছাপতে এলে—

বাকী ইসারাটুকু ইলেকশন কর্মীবৃন্দরা ভাল করেই বোঝে। তারাও যেন একটা করবার মত কাজ পেয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়।

মিঃ হেডউড আরুলাস্থানের নামটা দেখে চমকে উঠে। মিঃ ডান্‌কান বলে ওঠে, আনে দেও উস্‌কো।

উসকো বহুত প্যার করতা সব লোগ, কুছ ডর কা বাত হ্যায়।

মিঃ হেডউডের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলো। কালো শীর্ণ চেহারা, চোখদুটোতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি। সে যদি কোন দিন ক্ষমতা হাতে পায় এদের যতটুকু ক্ষতি করা সম্ভব তা সে করবে। সুরযপ্রসাদ বাবু স্মরণ করিয়ে দেয় ডানকানকে—

This is the fellow who spoke in the conference and was sacked from the colliery sir. You know it !

—I see···এতক্ষণ মিঃ ডান্‌কান ব্যাপারটাকে হালকা ভাবেই নিয়েছিল, প্যাঁচ কষছিল কাকে দলে টানবে—চাঁদকে না নতুন লোকটিকে। একবার বাজিয়ে দেখবার মতলবও এঁটেছিল। কিন্তু তার পরিচয় শুনে একটু স্তম্ভিত হয়ে যায়। একে আর যা হোক পয়সা দিয়ে কেনা যাবে না। হেডউড সাহেবের মনে আজ যেন বেশী চিন্তা। বলে,

He is a very cunning fellow Mr. Duncan ; try to stop him, or he will take you to guts.

মিঃ ডান্‌কানের মনে চিন্তার ছায়া। প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে চেয়ার ছেড়ে। মুখের পাইপটা থেকে অনর্গল ধোঁয়া বার হচ্ছে। সারা ঘরটায় থমথমে নীরবতা! সত্যিকার যেন একটা গোলমালের সন্ধান সে পেয়েছে।

হঠাৎ মেমসাহেবের চীৎকার কানে আসে—

মশাল্‌চি, গোসলখানামে পানি কাহেকো নেই দিয়া? মশাল্‌চি! কাহা হ্যায় টুমলোক? সব গিয়া কিডর?

মশাল্‌চি বাবুর্চি থেকে শুরু করে দুচার জন দ্বারোয়ান পর্যন্ত নাই। মেম-সাহেব হাঁকডাক শুরু করেছে। বাচ্চা বয়টা এসে সংবাদ দেয়—

সবলোগ জৌলুসমে গিয়া মেমসাব!

সংবাদটা প্রকাশ পায়,...মালকাটাদের চেষ্টায় আজ একটা শোভাযাত্রা বের হয়েছে, হাটতলায় সমবেত হয়ে তারা মীটিং করবে, আরুলাম্বান তাতে লেকচার দিতে আসবে। সেইখানেই গেছে সবাই। মিঃ ডান্‌কানের ঘর-গেরস্থালীতে প্রায় ধর্মঘট শুরু হয়েছে। মেমসাব চীৎকার করতে করতে ঢোকে—

Bill, sack them all!

স্ত্রীর কথার জবাব দেয় না মিঃ ডানকান, ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দেবে না সে। যে সূচনা আজ থেকে শুরু হল তা যদি পূর্ণতা লাভ করে, এর চেয়ে অনেক বৃহত্তর বিপদ আসার সম্ভাবনা আছে সেটা তিনি অনুমান করেন।

চাঁদকো বোলাও, আউর সূরযপ্রসাদ বাবুকো। **Any way we shall have to win. No question of money.**

সূরযপ্রসাদবাবু বার হয়ে যাচ্ছে, সাহেবের ডাকে আবার ফিরে চায়।

Send some men in their meeting.

স্বরযপ্রসাদবাবুর পলিসি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বলে সে, **without anything?** চীৎকার করে ওঠে ডান্‌কান—**for heaven's sake, don't make a hell now!**

Yes sir, ক্ষুণ্ণমনে স্বরজপ্রসাদবাবু বার হয়ে যান।

বাংলো থেকে শোনা যায় হাটের সব জনতার কোলাহল, হাজারো মালকাটা ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি এসে জমেছে। তাদের হাট করা বন্ধ হয়ে গেছে, হাটুরেরা পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দেখছে। সমস্ত টিলা টিবিগুলো ভর্তি হয়ে গেছে জনতায়—কেবল মাথা আর মাথা। লোহাকারখানার শ্রমিক সঙ্ঘই তাদের সাহায্য করেছে জিপখানা দিয়ে, ব্যাটারী থেকে লাউডস্পীকার চালাবার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।···

কালো দীর্ঘ চেহারা, সর্বাঙ্গে রুক্ষতার ছাপ ; ঋজু দেহখানা তুলে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলে চলেছে সে—

···সাজানো বাংলো, সাহেবী খানা—সাহেবী পোষাক···এ জুগিয়ে দেবার ভরসা তোমাদের দিতে আসিনি ; শোনাতে এসেছি···ভরপেট খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার জন্য যেটুকু আমাদের দরকার তাই তোমাদের জুগিয়ে দেবার জন্য আমি চেষ্টা করব।

···আমরা জানাব আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা মাটির নিচের পাথর নই ; আমাদের প্রাণ আছে, আমাদের ঘর সংসার আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে ; যাদের দুঃখে আমাদেরও চোখে জল আসে। তাদের বাঁচাতে চাও তো তাদের লেখাপড়া শিখতে দাও, খেতে দাও, ওষুধ দাও। এই আমরা চাইব।

যে বলবে রাতারাতি তোমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দেব সে মিছে কথা বলবে। আমি তোমাদেরই একজন, তোমাদের আমার জন্ম হতে চিনে এসেছি, দেখে এসেছি।

…আমাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে…একছড়া কাঁচের মালা দেখিয়ে ওরা আমাদের কিনে নিতে পারে। কিন্তু এই ভুল আর আমরা করব না। আজ তোমাদের লোক পাঠাও যে তোমাদের হয়ে লড়বে, দাবী জানাবে। তোমাদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করবে। এই সুযোগ যদি তোমরা ছেড়ে দাও, দুঃখ তোমাদের কোনদিনই ঘুচবে না—না খেতে পেয়ে মরবে, বিনা চিকিৎসায় ছেলেকে হারাবে, বৌকে তোমার ধাওড়াতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

…মাইকের গম্ গম্ আওয়াজ ভেদ করে হাজারো কণ্ঠের গর্জনধ্বনি ওঠে—না—না—

আরুলাস্থান দম নিয়ে বলতে থাকে—

নিজেদের মধ্যে আলোচনা কর, কে সাঁচ্চা কে ঝুটা লোক তার বিচার কর। আজ আমিও তোমাদের দলে। মালিকের জুলুমে আজ আমি 'হঠাবাহার' হয়েছি। ওদের প্রকাশ করে বেড়াচ্ছি বলে।

অন্যদিন হাটতলার গোলমাল গুঞ্জনধ্বনি সমস্ত উপত্যকাটা ভরিয়ে দিত, আজ নিথর নীরবতা প্রকম্পিত করে তুলছে সেখানে মাইকের মধ্য দিয়ে একটি দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। মিঃ ডান্‌কান হেডউড সাহেব বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে চলেছে সেই বজ্রনির্ঘোষ। এদের সমস্ত চক্রান্ত ছাপিয়ে উঠছে প্রবল ধ্বনি।

মিসেস ডান্‌কানের প্রসাধন শেষ হয়েছে। ছুটির দিন, পনের মাইল দূরে সহরের ক্লাবে আজ ককটেল পার্টি: আসবে সবাই। মেমসাহেবের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙে—Bill, won't you go?

মিঃ ডান্‌কান কথা কয় না। কি যেন ভাবছে, মিঃ হেডউড বলে ওঠে—The devil!

মিঃ ডান্‌কান স্ত্রীর দিকে ফিরে চায়, কষ্ট করে মুখে হাসি এনে বলে ওঠে—Oh yes, darling!

ভিতরের দিকে চলে যায়, তার বিলকে এত বিচলিত হতে বড় একটা দেখে নি মিসেস ডান্‌কান।

সোয়ীর শূন্য দিনগুলো আজ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে প্রতিবাদের জ্বালা তাকে চাঁদের ঘর থেকে বার করে এনেছিল, যে বিদ্রোহী মন তাকে শিখিয়েছিল তার নীচতাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে, সেই প্রাণসম্পদই তাকে টেনে এনেছিল বাইরের এই জোয়ারে। বৃহত্তর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে।

মুগ্ধ করেছে—উন্মাদ করেছে তাকে এই জীবন!

আরুলাম্বানকে সে ঘৃণা করত প্রথম জীবনে, জারজ—মিশনারী হোমের অন্নদাস বলে, কিন্তু আজ চিনেছে তার মধ্যের সেই জ্বালাময় সত্তাকে, যার আগুনে সোয়ীর মনের নিভু নিভু বহ্নিশিখা হয়ে উঠেছে প্রদীপ্ত। আরুলাম্বানের কর্মব্যস্ত জীবন তাকে মুগ্ধ করেছে।

প্রথম প্রথম সোয়ীর মীটিংএ যেতে লজ্জা করত। এত লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর লজ্জা ক্রমশঃ তার দূর হয়ে গেছে। রোজ সন্ধ্যাবেলা আরুলাম্বান তাকে শোনাতে থাকে আজকের কথা, অবাক হয়ে শোনে সোয়ী। তাদেরই আশেপাশের কলিয়ারি—সেখানকার মালকাটাদের এই দুরবস্থার কথা।

তবে যে বলে লুকে থাকতে পায় ওরা, হপ্তা পায়—

—থাকে কোনখানে দেখাব তোমাকে, আর হপ্তা যা পায় তাতে জলটুকু অবধি কিনে, ছেলে পিলে খাওয়ান জোটে না; তার উপর বিপদ আপদ আছে।

হাসতে থাকে আরুলাম্বান সরল প্রাণ খোলা হাসি। বলে,

আজও সবাইকে ফাঁকি দিতে চাইছে। উদের লুক না হলে ইসব শুনবেক নাই, তাই চাঁদকে হাতে করেছে উরো।

চাঁদের নাম শুনে সোয়ী চটে ওঠে, বিষিয়ে উঠে তার সারা মন।

কুকুরটো কুথাকার! উয়ো এঁঠো পাতা চাটতে গেছেক উদের।

আরুলাস্থান কথাটা শুনে বিস্মিত হয়ে যায়! নিজের স্বামী, তার সম্বন্ধে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং সতেজ প্রতিবাদ যে সামনা-সামনি করতে পারে—তাকে শ্রদ্ধা না করে পারে না! সোয়ী বলে চলেছে—

না, উকে জেনেশুনে এগুতে দেওয়া হবেক নাই, তুমি জান না উ সব পারে, সব পারে!

বলে আরুলাস্থান, তাই আমরা তাকে বাধা দুব।

আমিও আছি তুমার দলে।

প্রদীপের ম্লান আলোয় দেখতে পায় আরুলাস্থান সোয়ীর চোখে প্রতিবাদের জ্বালা। মীটিংএ যেতে চাইত সোয়ী, বাধা দিত সেই—

লোকে তুকে দুষবেক।

কেনে?

চাঁদের বৌ হয়ে তারই বিরুদ্ধে বলতে আমাদের সঙ্গে জোট পাকিয়েছিস, এটো কি ছেড়ে দিবে লোকে?

বলুক, লুকের খাই না পরি? সত্যি কথা যিদিন সবাই জানবেক আমার মাথা সিদিন নীচু হবেক নাই।

এর পর থেকে আর তাকে বাধা দেয়নি আরুলাস্থান।

ফুকন দেখে সোয়ীর শুকনো মুখে আবার এসেছে হাসির জোয়ার। প্রাণের আবেগ যেন কানায় কানায় উপছে পড়ে। হাসির ধারাল শব্দে মুখর হয়ে ওঠে নীরব ঘরগুলো। গুণগুণ করে গান করতে করতে মাটির হাঁড়িতে করে আরুলাস্থানের জন্য চায়ের জল চাপায়।

শত কাজের ফাঁকে ফুকনের মনে কোথা ভাঙন ধরেছে। সোয়ীর

এই হাসি—গান যেন তার মাঝে মাঝে ভালো লাগে না, বিশেষ করে কোথায় জন্ম নেয় ফুকনের মনে একটা স্বার্থপর প্রাণী—এতদিন সোয়ী ছিল তারই! আত্মসমর্পণ করেছিল সোয়ী যখন তার কাছে, সেদিন তার মন সাড়া দিতে রাজী হয়নি, আজ সোয়ীর মনের এই নবজাগরণ যেন তাকে বিচলিত করে তুলেছে।

হাসির শব্দ।

চা খেয়েই বেরুতে হবে।

আরুলাম্থানের কথায় সোয়ী বলে ওঠে, সি ভয় তুমার নাই, আজ দেখবা উত্তর ডুংরীর মেয়ে-মদ্দ সবাই তুমাকে মাথায় করে চলবে।

তুমিই ত করেছ এসব।

হুঁত কি? আমি বলতে পারি না কইতে পারি? বাহারের বল কিম্ভুক তুমি!

ফুকনের মনটা অজানা অভিমানে মোচড় দিয়ে ওঠে। কই তাকে ত কোনদিন এমনি করে প্রশংসা করেনি! এসেছিল গভীর নিশীথে চুপিসাড়ে কোন অবচেতন মনের ব্যাকুল বেদনা নিয়ে, সোয়ীকে ঢুকতে দেখে গম্ভীর হয়ে যায় ফুকন।

চা খাবি নাই?

উ আমি খাই না।

দেখ কেনে, জাড়ের বিয়েনে ভালো লাগবেক রে।

বুললাম ত খাব নাই।

রাগ হইছে তুর, না?

ফুকন কথা কয় না, বার হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। তার গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে সোয়ী, একটু বিচিত্র ঠেকে ওর সহসা এই পরিবর্তন।

আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে ফিরছে সোয়ী। হাটে আজ লেকচার দিয়েছে, আরুলাম্বান জোর করে তাকে তুলে দিয়েছিল। মুগ্ধ মালকাটা জনতা, ছেলে-মেয়ে সকলেই। তাদেরই জাতের একজন মেয়েকে কখনও এত লোকের সামনে জৌলুসের মধ্যে এসব কথা বলতে শোনে নি। তারা ব্যগ্র হয়ে শুনতে থাকে সোয়ীর কথাগুলো।

সারা দেহে মনে তার দুর্বার উত্তেজনা। শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয় চঞ্চল রক্তস্রোত! শীতের হাওয়াতে সারা গা—কপাল দিয়ে বার হয় বিন্দু বিন্দু স্বেদরেখা।

সে বলে চলেছে—যি তোমাদের লোক বলে ঘুরে বেড়াছে সেই চাঁদমাঝি, আমার স্বামী। তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী আমি তাকে চিনেছি, জেনেছি। আর সিই থেকে আমি তুমাদিকে জানান দুব—উ তুমাদের কুন উবকার করবেক নাই। উ সাঁওতাল ওঁরাওএর জাত হয়ে তাদিকেই মেরে ফেলান করাবেক। আহেরিয়া শিকার আমাদের উয়ার থেকেই বন্ধ হইছে, লিজের কাঠের ব্যবসা চালাবার লেগে··· তুমাদিকে কম মাইনেতে চিনকুঠিতে কাজ করাতে উয়ার টুকচেনও মরমে লাগবেক নাই; উয়ার চেয়ে আরও খপর আমি জানি, তাই সোয়ামীকেও মানিয়ে লিতে আমার বেধেছে—ছেড়ে আইছি···

মন্ত্রের মত মালকাটাদের গুঞ্জনধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যায় তার কথায়। ওদের ঘরের কথা, শত শত হতভাগ্য মাঝিদের অন্তরের সুখ দুঃখ আশা আনন্দের কথা সোয়ীর মুখ থেকে শুনে তারা যেন আপনজনকে খুঁজে পায়।

চাঁদ ইতিমধ্যে এসে পড়েছে মিঃ ডান্‌কানের বাংলোতে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের মধ্য দিয়ে সোয়ীর কথাগুলো শুনছে। তারই বিরুদ্ধে এই সত্যপ্রচার যেন ক্ষিপ্ত করে তোলে তাকে। শিরায় শিরায় তাণ্ডব নর্তন ওঠে, বন্য রক্তের গর্জন করে ওঠে সে—

খ্যাষ করে হুব আজ তুকে! টুঁটি টিপে খ্যাব করে হুব!

লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নামতে যাবে,মিঃ ডান্‌কান তার কলারটা চেপে ধরে—**Stop, it Chand.**

এতবড় বাড় ও হারামজাদীর!

সুরযপ্রসাদ বাবু এগিয়ে আসে—

উকে খ্যাষ করে দিলে তুমি শেষ হয়ে যাবে চাঁদ!

তাইই সই!

ধমক দিয়ে ওঠেন সাহেব—**Dont be silly, you fool!**

সোয়ীর কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে—

জেনে শুনে তুমরা আমার মত এই সাব্বোনাশ ডেকে আনবা না। শুধু আমাকে নয়, আমার মত অনেক মেয়েকেই উ খ্যায করে দিয়েছে। কত লুককে যে—

ছেড়ে দাও সাহেব, উকে আমি রাখব নাই!

চাঁদ নিজেকে ছাড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। চোখ মুখ তামাটে হয়ে গেছে তার। মিঃ ডান্‌কান ওকে ছেড়ে দিয়ে কোণে ঠেসান দেওয়া রাইফেলটা তুলে নেন।

Move, and I will shoot you!

থমকে দাঁড়াল চাঁদ। একবার নিজের চোখে দেখেছে ওই রাই-ফেলের গুলিতে তাজা মানুষটা কেমন করে পাহাড়ের উপর থেকে গাছপালা পাথর সমেত গড়িয়ে পড়েছিল, ফিনকি দিয়ে ছুটেছিল তাজা রক্ত···আহেরিয়ার শিকার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে লোকটার মৃত্যু-কাতর মুখ।

থমকে দাঁড়াল সে।

সুরযপ্রসাদ বাবু চাঁদকে বোঝাতে থাকে,—মাথা ঠাণ্ডা করে কাম করতে হোবে চাঁদ। উরা আউর ভি কত বলবে। হামাদিকে তার

জবাব দিতে হবে। উ মেয়েটা ভ্রষ্টা আছে। মানে bad character আছে···

স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনে চলেছে চাঁদ। তার সব কিছু ঘুলিয়ে আসে।

কাজের মধ্যে পড়লেই মানুষের মন অবসরের প্রকৃত মূল্য বোঝে। সোয়ী তাই তার কাজের ফাঁকের সময়টুকু মনের স্পর্শে ভরিয়ে নিতে চায়। আজ ফুকনকে সে সত্যই কাছে পেতে চায়, সেই ব্যাকুল কামনা নিয়েই ফুকনকে ডাকতে গিয়েছিল। আজ ফুকন তাকে ভুল বুঝেছে।

জীবনের শূন্যতা যত বাড়ে···কথা দিয়ে যেন সেটাকে ভরাট করে নিতে চায়। উর্ণনাভের মত তাই নিজের চারিদিকে জালই বুনে চলেছে কাজের। বন্দী করে ফেলে নিজেকে এ অভূতপূর্ব উন্মাদনায়।

সকালবেলায় ফুকন গাড়িখানা হাঁকিয়ে বনে কাঠ আনতে যাবে, সোয়ীকে দেখতে পেয়েই বলে ওঠে—আসতে দেরী হবেক আজ, যেছি।

বেশ।

স্বাভাবিক মেয়েই সোয়ী। কালকের রাতের অশ্রুময়ী ব্যাথাতুরা নারী রাতের অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেছে, দিনের আলোর মতই ঋজু সবল মেয়ে সে। বলে ফুকন—বেরুবি নাকি আজ?

দেখি, উ যদি বলে যেতে হবেক—কুন কালিয়ারিতে যাবেক বলছিল।

ফুকনের মনটা কেমন হয়ে যায়। আরুলাম্থানকে নাম ধরেও ডাকেনা, ইশারা ইঙ্গিতে ডাকে, আর নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা যেন কিছু সোয়ীর নাই, তার উপরই নির্ভর করছে ওর কর্মজীবন। নীরবে ফুকন বার হয়ে

যাচ্ছে, সোয়ীর ডাকে ফিরে চাইল। হাসির ঝলক তুলে সোয়ী বলে ওঠে—বারে, মুড়ি নিয়ে যাবি নাই, কাল সারা রাত ত বাসাতা খেয়েই কাটালি! রাগ কি তুর এখনও পড়েনি!

মুড়ির গামছাটা কাঁধে ফেলে নিতে যায় ফুকন, সোয়ী তার হাতটা ধরে ফেলে, তু কি পাথর না মানুষ?

কেনে?

চুপ করে যায় সোয়ী, কি যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়। বলে ওঠে ঢোক গিলে—একটা লোক তুর লেগে না খেয়ে রইল সারারাত, একবার শুধাতে গেলি না!

ফুকন মুখ তুলে চাইল সোয়ীর দিকে, গভীর কালো চোখে স্থির নিস্পন্দ চাহনি। ক্রমশঃ হাসির ঝলকে রঙীন হয়ে ওঠে সোয়ীর মুখ। সকালের আলোর মতই মিষ্টি একটা আবেশ ভরে ওঠে ফুকনের মনে!

হঠাৎ কাশির শব্দে চমকে সরে যায় দুজনে, আক্লাম্বান একটা বিড়ি ধরিয়ে প্রাণপণে টানছে আর কাশছে। ও হয়ত দেখে ফেলেছে ঘটনাটা। একটু যেন লজ্জিতই হয় সোয়ী।

সূরযপ্রসাদ বাবু এবং ম্যানেজারদের কৃপাতে পয়সার জোরে চাঁদ এখন ডুংরীর সারা অঞ্চল মাতিয়ে তুলেছে। বিভিন্ন ডুংরীতে শুয়োর আর মদ দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

রাতের বেলায় মত্ত মাঝিদের মাদলের বেতালা শব্দে নীরব বনভূমি মুখর হয়ে ওঠে। মালকাটাদের ধাওড়াতে যাতায়াত শুরু করেছে চাঁদের লোকজন। হাটতলার অফিস গম গম করছে; মাইকে দিনরাত গান চলেছে, মাঝে মাঝে গান থামিয়ে লেকচার শুরু হয়, আবার শুরু হয় গান।

মালকাটা ছেলেমেয়ে—ডুংরীর মাঝিমেঝেন গান শোনবার জন্যই ভিড় জমায়। আর কি হচ্ছে না হচ্ছে বিশেষ খবর রাখে না।

সুরযপ্রসাদ বাবু জব্বর চাল চলেছে। তাদের ইস্তাহারে আরুলাম্বানের জন্ম-ইতিহাস, তার কুৎসিত জীবন, সোয়ীর চরিত্রহীনতা এবং তার সঙ্গে আরুলাম্বানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—এই নিয়ে সাঁওতাল ওঁরাও বস্তিতে মাতব্বরদের নিজে শুনিয়ে আসছে নিয়মিতই।

চাঁদ আপত্তি করেছিল—বাবু ইটা ঠিক হবেক নাই!

তুর বৌ যদি ঠিক হবে তবে কেন ওই লোকটার সঙ্গে এত মিশছে, ঘরে রেখেছে? সাথে সাথেভি হেথাসেথা রাতের বেলায় আসছে যাচ্ছে, এসব কি?

চাঁদ নিরস্ত হয়।

স্বপ্ন দেখে চাঁদ, সে আর ডুংরীতে বাস করবে না, ডান্‌কান সাহেবের মত বাগান ঘেরা বাংলোতে থাকবে, অমনি একখানা গাড়ি হবে আর। বিয়ে সে করবে কিন্তু আর সাঁওতাল মেয়েকে করবে না। হেডউড সাহেব আশ্বাস দিয়েছেন, বিয়ে তাঁর তিনিই দিয়ে দেবেন। ইংরেজী জানা মেয়ে। সেই বিশ্বাস আর আশা নিয়ে চাঁদ আর কোনো কাজেই বাধা দেয় না। যা ইচ্ছে ওদের সোয়ীকে নিয়ে করুক। ওর সঙ্গে সোয়ীর কোন সম্বন্ধ আর নাই। অফিস ঘরের ওদিকে একটা ছোট ঘরে মাঝে মাঝে ঢুকে একটু তৃষ্ণার নিবৃত্তি করে যায়।

…এতদিন ছেলের এইসব কাণ্ড নীরবে সহ্য করে আসছিল সুন্দর মাঝি, ক্রমশঃ সে অধৈর্য হয়ে ওঠে। বাধা দেয় সুন্দর—

না। ইসব হতে দুব নাই আমি। সাঁওতালের ছেলে, সাতাশীর কেউ তুকে চায় না। তুই উদের হয়ে দালালী করতে যাবি কেনে?

Right, আমি ঠিক করছি সব্বাইকে কিনে লোব। একবার জিতে যাই! টাকার জন্য ভেবোনা, দুহাতে টাকা লিয়ে আসব।

টাকা আমার চাই না! চটে যায় সুন্দর মাঝি।

বুড়োর সারা মনে ঝড় বয়ে চলে। ছেলের এই ব্যবহারে বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে তার উপর। লোকের মুখে শুনেছে সে নাকি মিশনারি হোমে ঘন ঘন যাওয়া আসা করে, দুচারটে বদপ্রকৃতির মেয়েরও অভাব নাই। জাতও দিয়ে দেবে এইবার। বুড়োর বুনো রক্ত মাঝে মাঝে উষ্ণ হয়ে ওঠে, বুড়ি মেঝেনের মুখ চেয়ে সহ্য করে যায়। দোষ তারও কম নাই, কি কুক্ষণেই সে চাঁদকে কাঠের ব্যবসা করতে পাঠিয়েছিল চিনকুঠীতে!

সেদিন বুড়ো সুন্দর মাঝি রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত ফুঁসতে থাকে। বনদার মহাজন কথাচ্ছলে পকেট হতে একটা ছাপান কাগজ বার করে দেয়—দেখেছো সর্দার, তুমার ছেলের কীর্তি!

বলোনা উটোর কথা বনদার, মনে হায় করতাম আমি! কি লিখেছে?

বনদার পড়তে থাকে। সোয়ী তারই বৌ, সুন্দরের বন্ধু রাঙা সর্দ্দারের মেয়ে; তার সম্বন্ধে কুৎসিত নোংরা কথা, মিথ্যা জঘন্য কাহিনী লিখে ছাপিয়েছে স্বরযপ্রসাদবাবু।

আরুল্লাহ্‌ানকে দেখেছে সুন্দরমাঝি, শুনেছে তার কথা; তার সম্বন্ধে সোয়ীকে নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত।

চীৎকার করে ওঠে সুন্দর মাঝি—থামো থামো বনদার, উসব শুনিও না, শুনতে নাই।

কিন্তুক উরা লিখেছে!

উদের লিখবার কী ক্ষমতা আছে? মাঝি ওঁরাওর কুন দোষ ঘটে, সাতাশীতে বিচার করবেক; উরা আমাদের কে?

তুমার ছেলে লিখেছে যি!

ছেলে? ও আমার কেউ লয়। আজ থেকে কুন সম্বন্ধ আমার নাই, সাঁওতাল সাতাশীর নাই।

গর্জাতে থাকে সুন্দর মাঝি। মনে পড়ে সেই দিনকার কাইজোড়ের ধারে সেই বুড়োর কথা—কুনদিন তুর মা-বাপ ঘরের বৌকে উদের কাছে বিচে দিবি! আজ বৌএর সম্মান সে বিক্রি করেছে ওদের কাছে।

হঠাৎ থেমে যায় সর্দার। চোখ দুটো ওর জ্বলছে, সারা শরীরে প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্তস্রোত। উঠে চলে গেল ঘরের ভিতর। হ্যাঁ, বিচার সে নিজের হাতেই করবে!

রাত হয়ে আসছিল, চাঁদ বাবার ডাকে ফিরে চাইল। সুন্দর মাঝির কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে। একটা ঝড় উঠেছে ওর সারা মনে—এটা অনুমান করতে পারে চাঁদ। এগিয়ে আসে সুন্দর—

কিসব ছাপিয়েছিস তুরা বৌয়ের নামে?

মিছে কথা ত লয়!

তার বিচার করবে আমাদের সাঁওতাল সাতাশী, উরা তুর উই চোদ্দপুরুষরা তার বেত্তান্ত কেনে যাতা করবে লুকের কাছে?

বৌ···বিজাতের ঘরের মেয়ে!

গর্জন করে ওঠে সুন্দর চাঁদ—মুখ সামলে কথা কইবি! বিজাত! রাঙা সর্দার বিজাত···ডুংরীর সাতাশীর সর্দার, তার নামে এতবড় কথা! তুর নিজের বৌ···তাকে তাড়িয়ে দিইছিস, ছ্যাশের লুক তুকে বলে উদের পাতচাটা কুকুরটো! লাজ নাই তুর?

সাতাশীর মাঝিরাই তুমার দেখছি আপন!

যাদের মাঝে মানুষ হলম, যি মাটি জল দানা খেলম, সি মাটি, সি মানুষই আমার আপন, তুর মত পরের পাতচাটা ছেলে আমার নাহলেই হতো ভালো। শ্যাষবারের মত বলে দিছি, উসবে যদি থাকবি, ইখানে আর আসতে হবেক নাই।

তাই হবেক! বার হয়ে যায় চাঁদ।

সুন্দরের রাগটা তখনও পড়েনি। সাবধান করে দেয়—

ফির যদি শুনি, হুরুকে গিয়ে আমাদের সাতাশীর কুন ছেলে মেয়ে বৌঝিকে লিয়ে মস্করা করেছিস, খ্যাষ করে দুব তুকে। কুন খাতির রাখব নাই, বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা ইখান থেকে। ইরো যদি আসিস আর বেঁচে থাকতে দুব নাই। তুর সাথে আজ সব শেষ হয়ে গেল।

চাঁদ নীরবে মাথা নিচু করে বার হয়ে গেল।

আজ যেন বদ্ধপরিকর হয়েই সে বেরিয়ে এলো। পিছনের সব রঙিন স্বপ্ন তার মুছে গেছে, মাঝি ওঁরাওদের সঙ্গে নাড়ির বন্ধনও ছিঁড়ে গেল। মায়া বিশেষ কিছুই অবশ্য ছিল না।

নীল রুক্ষ পর্বতসানু, কঠিন লাল মৃত্তিকা, পলাশের রক্তরাঙা ফুলের ইশারা তাকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তৃপ্ত করেছে, মায়া এনেছে এই লাল টাইলের বাংলোর নেশা; কুর্চি বনতুলসী ফুল নয়, ডালিয়া ক্যানা ফুলের বর্ণসম্ভার—হেডউডের নির্ধারিত কোন এক ইংরাজী-বলা মানসী প্রিয়া।

মায়িথানের কাছে জোড়ের জল পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। হাটতলায় মীটিং আছে, তাকে থাকতে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে এই যুদ্ধ তাকে জিততেই হবে, নাহলে ভবিষ্যৎ তার অন্ধকার।

ফুকন কাঠ-বোঝাই গাড়ীখানা হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে বন থেকে। সারাদিন খায়নি বলেই ঝরনার জলে মুড়ি ভিজিয়ে খেয়েছে। শুকনো পাতার গুঁড়ো ঘামের সঙ্গে মিশে সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়েছে। রোদ হলদে হয়ে আসছে, বনের বালুময় পথ ধরে আসছে গাড়ীটা হাঁকিয়ে। বৈঁচি—বন আটাড়ির ঘন পাতার বুকে স্বর্ণলতাগুলো আঁকড়ে ধরেছে প্রবল আলিঙ্গনে। ঝিঁঝি পোকার শব্দ আর চাকার একটানা খস

থস আওয়াজ কানে আসে। হঠাৎ কাদের কণ্ঠস্বর শুনে উৎকর্ণ হয়ে যায়। সোয়ীর সম্বন্ধেই কারা যেন বলাবলি করছে।

ছেড়ে দে। মেয়েটো পেথমে ফুকনটাকে লিয়ে মজা উড়ুলেক, ইবার ধরেছে লোতুন ওই ছোঁড়াটাকে—কি যি নামটো রে ?

তাই কি ?

হুঁত কি, ফুকনাটা কেনে যে উরো পড়ে রইছে জানিস না ? মিনি কাজে কি কেউ খাটেরে ?

কর্মক্লান্ত দেহে ওদের কথাগুলো জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

লোকদুটো ঝোপ থেকে বার হয়ে আসছে, সামনেই ফুকনকে দেখে একটু শুকনো হাসি টানবার চেষ্টা করে তারা। ওদের চেনে ফুকন, বনদার মহাজনের লোক।

কি হে ফুকনমাঝি, কাঠ কাদের ? সাঙ্গীণ বুঝাই করেছ লাগছে !

—হুঁ ! নীরবে গাড়ীখানা হাঁকাতে থাকে। ওদের তীব্র চাহনি থেকে দূরে সরে আসতে চায় সে। পিছন থেকে লোকগুলোর তীক্ষ্ন হাসির ধারাল শব্দ একটা ভেসে আসে। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দেয় ফুকনের।

ফিরে এসেছে আরুলাম্বান, হতাশ হয়েই ফিরে এসেছে, হাতে করে এনেছে সোয়ীর সম্বন্ধে ওদের বিকৃত পরিচয় বহন করা একখানা কাগজ। ওদের টাকা ওদের পাটোয়ারী বুদ্ধি ওদের নীচতা সবকিছু লাগিয়েছে তাদের পরাস্ত করতে।

কী ভাবছ এত ?

সব হয়ত ফেঁসে যাবে সোয়ী, শুধু শুধুই তোমাকে এই পাঁকের মধ্যে টেনে আনলাম। কি লিখেছে শুনেছ তো ?

হাসে সোয়ী—লিখবেক তা জানতাম। চাঁদমাঝির অসাধ্য কাজ কিছুই নাই। ইতে তার সম্মানটা বাড়ল কিনা ?

সমস্ত ডুংরীর সাতাশীকে মদমাংস খাইয়েছে ওরা। দরকার হলে টাকাও দিবে।

সোয়ী ভাবতে থাকে। বেলা গড়িয়ে আসছে। ফুকন এখনও ফেরে নি। হলদে রোদ পাহাড়-কোল ভরিয়ে দিয়েছে।

—লাও, সিনান ভাত করে লাও, পরে যাহয় দেখা যাবেক। মাঝি ওঁরাও লোক চিনবেক।

আরুলাম্বানের খাওয়া যেন মাথায় উঠে গেছে, তবু ও সোয়ীর জন্যই খেতে বসে।

লোহা কারখানার কয়েকটা কলিয়ারির শ্রমিকদের জোরেই আজ তাকে পথ চলতে হবে, কে জানে ডুংরীর সাঁওতাল মাঝিরা তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে কিনা!

ওই, কি ভাবছ—ভাত দুব আর? উঠোনা, দুধ লিয়ে আসি।

সোয়ীর সেবা যত্ন আরুলাম্বানের কৃতজ্ঞতার বোঝাই বাড়িয়ে তুলবে সে যদি পরাজিত হয়! দুধের বাটিটা নামিয়ে দিয়ে বলে উঠে সোয়ী,

ওই, আচ্ছা আইবুড়ো লুক তুমি, মাগছেলে ঘর সংসার তিনকুলে কিছুই নাই, ভাবনার কি আছে বল দেখি!

তার চেয়ে ঢের বেশী ভাবনা সোয়ী। ঠিক বোলতে পারবনা। তবে জেনে রেখো আমি যদি জিতি···সঙ্গে সঙ্গে জিতবে বহু হাজার সাঁওতাল বহু হাজার ওঁরাও···তারা আমারই মুখ চেয়ে আছে।

আরুলাম্বানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক অজানা আনন্দে। সোয়ী বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

ঘর্মাক্ত শ্রান্ত ফুকন ঘরের জানালা থেকে দেখেছে সব দৃশ্যটাই। অত ঘনিষ্ঠভাবে, আবেগময় ভাষায় কি সব বলছে দুজনে। সারাদিন খাওয়া নাই, কঠিন পরিশ্রম, রোদের তাপ···সবকিছু মিলে তাকে বদলে দিয়েছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসছে। অন্য সময় হলে সোয়ী বার

হয়ে আসত ছুটে, এগিয়ে দিতে বাটিতে গুড় আর তকতকে ঘটিতে করে কাচধার জল। আজ নেহাৎ মুনিষ মান্দেরের মতই অবহেলিত সে।

বনদার দুজনের কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্যি। কিন্তু প্রতিবাদ করবার ভাষা নাই, কি দাবী তার আছে তার উপর! নীরবে সয়ে যাওয়া ছাড়া কোন পথই তার নাই। সেই পথই নেবে সে।

সোয়ী কথটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে চলেছে ফুকন, ইথানে আর থাকব নাই আমি।

কেনে?

বসে বসে খাব কদ্দিন? কাজ পেয়েছি, মদন মাঝির ঘরে, সেখানেই থাকবো।

চলে যাবি তুই? সোয়ীর চোখদুটো তুলে ওর দিকে চাইল। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখ। বলে সোয়ী,

কেনে যাবি তা জানি। উসব মিছে কথা। তু আমার সঙ্গে কুন সমন্ধ আর রাখবি নাই।

লুকে যা-তা বলছে—

ফুকনের কথাগুলো ডুবিয়ে দিয়ে বলে সোয়ী—

আর তু তাই মেনে লিলি। এতদিন ধরেও কি একটো মানুষকে চিনতে পারিস না?

ফুকনের কাছে সে রাত্রের চোখের জল নিছক অভিনয়ই বলে মনে হয়। বলে ওঠে সে, নিজের চক্ষে দেখেছি—

বাধা দেয় তাকে সোয়ী—কী, কী দেখেছিস—বল্! বল্ তুই!

—উই আরুল্লাহ্বানের সাথে তুর হাসি মস্করা!

চটে ওঠে সোয়ী। বিজাতীয় ঘৃণার ভাব ওঠে তার অন্তরে ফুকনের উপর। চীৎকার করে ওঠে—

চুপ কর্, চুপ কর্ ফুকন! বোঙা দেখবেক—সেই ইয়ার বিচার করবেক।···তু যেখানে যাবি চলে যা। চলে যা তু।

ধীরে ধীরে বার হয়ে এল ফুকন। সোয়ীর ব্যক্তিত্বের সামনে তার কথাগুলো যেন ভেসেই গেল। সোয়ী তার সঙ্গে এই ব্যবহার করবে সে ভাবতেই পারেনি। হয়ত সত্যই সে নির্দোষ—তাই এত কঠিন ভাবে প্রতিবাদ করতে পারল। কিন্তু ফেরবার পথ নাই ফুকনের। সে বার হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। পাহাড়তলীর ডুংরীতে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার।···আকুলাস্থান বাইরে থেকে ফিরে এসে সমস্ত ঘরটা অন্ধকার দেখে থমকে দাঁড়ায়। নীরবতা ভেদ করে কানে আসে কার কান্নার শব্দ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সোয়ী।

চারিদিক থেকে এই অপমানের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠেছে। ফুকনও তাকে এই অপবাদ দিয়ে গেল! হঠাৎ আকুলাস্থানকে প্রবেশ করতে দেখে সামলাবার চেষ্টা করে।

একি!

নিজের দৈন্যের কথা প্রকাশ করতে পারেনা সোয়ী; চাপতে থাকে—কিছু নয়।

জেনেছি আমি। ফুকন চলে গেল, ডাকলাম, ফিরেও চাইল না। চোখেমুখে ও-জ্বালার মানে আমি বুঝি। আজ আমার জন্যই এই সব দুঃখ কষ্ট পাচ্ছ তুমি। তখন তোমাদের আশ্রয়ে না এলেই হয়ত ভালো ছিল। এখনও পথ আছে।

সোয়ীর মনে আবার সেই প্রতিবাদ ফিরে আসে, বলে সে—না! ফেরা হবেক নাই। আমি আবার মানুষ, তার আবার নিন্দে কুচ্ছো! করুক ওরা যত পারে। ইসব হবে জেনেই ত আইছিলাম আমি, ফেরবার লেগে লোক হাসাতে আসি নাই।

আরুলাম্বান যেন বিস্মিত হয়ে যায় ওর দৃঢ়তায়। এগিয়ে আসে সে—

সোয়ী, আমি-তুমির কোন দাম নাই ইখানে, উদের কাছে মাথা নোয়ালে আজ সমস্ত লোক নিরাশ হবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, ওদের সমস্ত চাল বানচাল করে দিতে হবে আমাদিকে।

সোয়ী উঠে বসে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে অন্তরের জ্বালায়; ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে প্রতিবাদের ছায়া, বন্য রক্ত দৃঢ়তায় সতেজ হয়ে ওঠে, বলে সে—

পারবো আমি!

ঠিক পারবে?

আরুলাম্বান যেন পায়ের তলায় আবার মাটি ফিরে পায়।

সুন্দরমাঝি পরম সমাদরে সোয়ীকে বসাল, আরুলাম্বানকে বসতে এগিয়ে দিল একটা মাচুলি। সোয়ীর কথাগুলো আজ বুড়ো সর্দারকে বিমুগ্ধ করে—তারই ঘরের বৌ, তারই বন্ধুর মেয়ে, সে কখনও ছোট হতে পারে না। এসব তারই কুলাঙ্গার ছেলের কীর্তি।

সোয়ী বলে চলেছে—

আজ তুমার ঘরের বৌ হয়ে আসিনি, এয়েছি সাঁওতাল সর্দারের কাছে জাতের ভালো-মন্দের কথা পাড়তে। আমাদের লুক দিয়ে সরকারকে বলতে হবেক। সৎ লুক হবেক সে, ভালমন্দ বুঝবেক, চিনকুঠির মালিক বড়লুকের পাতচাটা লুক হলে সারা জাতটোকে বিচে দিবেক উদের কাছে! বল সর্দার, উ তুমি কেনে হতে দিবা?

সুন্দর মাঝির মনে সোয়ীর কথাগুলো বারবার পাক দেয়। সে-ই সাঁওতালদের মাতব্বর; জাতের ভালমন্দর কথা যেখানে, সেখানে ছেলেও আপন নয়; দরকার হলে তাকেও ঘা মারতে হবে। নিজের ছেলেকে সে জানে। সোয়ী চিনেছে নিজের স্বামীকে, তাই বিশ্বাস

করতে পারেনা। সুন্দরমাঝিও জানে তার চাঁদকে। যাকে সমাজের শত্রু বলে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে, কী করে তার হাতে এতবড় দায়িত্ব তুলে দেবে? সুযোগ পেলেই যে সে এই অপমানের শোধই নেবে!

সর্দার, কী ঠিক করলে সর্দার? আরুলাম্থানের কথায় ব্যাকুল আশার স্বর।

তুমার নাম শুনেছি, জানিও তুমাকে। নিজের ছেলেই ইথানে বড় লয়, তাকে ঘর থেকে তাড়াই দিয়েছি। সে যাতে না পারে সেই চেষ্টাই করতে হবেক আমাদিকে।

সোয়ী আনন্দে হতবাক হয়ে যায়, আরুলাম্থান যেন বিশ্বাস করতে পারে না বুড়ো সর্দারের এই সোজা কথাগুলো!

কী কী করতে হবেক বলে দাও আমাদিকে?

আরুলাম্থান সর্দারকে নিয়ে পড়ে। বুড়ি মেঝেন সোয়ীকে দেখে চীৎকার করে ওঠে—

—কালসাপটো আইছে রে, ছেলেটোকে পর করে দিলেক! গর্জন করে ওঠে সর্দার—

চুপ কর্, আপদটো ঘর থেকে গেছে 'হায়' করেছি। ছেলে—ইমন ছেলে যেন শত্রুরও না হয়। তুর জড়ে আগুন লাগুক, লচ্ছার মাগী কুথাকার!

চুপ করে যায় বুড়ি। বলে ওঠে সুন্দর—

হাঁ, সাতাশীর মাতব্বরদিকে ডাকলম যেনে, তারপর?

পরম উৎসাহে সে শুনে চলেছে। বুড়োর শিথিল পেশীগুলো সবল হয়ে ওঠে,—একথা তাকে কেউ শোনায় নি। এতবড় সৌভাগ্যের চাবিকাঠি তার দালাল ছেলের হাতে তুলে দিতে পারবে না প্রাণ থাকতে।

আরও আগে আসনি কেনে তুমরা?

সাহস করিনি সর্দার। আজ তুমিই হাল ধর, আমি তোমাদের হয়ে কাজ করি।

সরল শিশুর মত হাসতে থাকে সুন্দর মাঝি। আগুনের ছোঁয়াচ তার বিগতযৌবন দেহে মনে নতুন কর্মশক্তি নিয়ে আসে। মনেমনে আঁচ করতে থাকে···দশহাজার মাঝি ওঁরাওএর জনতা নিয়ে সে ভোট দিতে চলেছে···তাদের বজ্রনির্ঘোষ আর নাকড়ার শব্দে আকাশ বাতাস পাহাড় বনানী মুখর হয়ে উঠেছে। সেই অন্ধকার-বিচ্ছুরিত মশালের আলোর ঝলকানি যেন সোয়ীর মুখে পরশ দিয়েছে।

···সংবাদটা বিদ্যুৎগতিতে পৌঁছে গেল ওদের শিবিরে। আরুলাম্থান বনরাজ্যে ঝড় তুলেছিল, শাল পিয়াল মাথা নাড়ছিল সেই হাওয়ায়; আজ সেখানকার বৃদ্ধ বট আর বনস্পতির বুকে এসেছে ঝড়ের প্রলয়-দোলা, মিঃ ডান্‌কান, সুরযপ্রসাদ বাবু একটু ঘাবড়ে যায়। ওদের জব্বর চাল, অত ইস্তাহার যেন সব ভেস্তে গেল।

চাঁদ তার বাবাকে চেনে। তার ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা, নেকড়ের মত ধারাল চোখের দীপ্তির কাছে চাঁদের দল সৎভাবে পেরে উঠবে তা সে ভাবতেই পারে না। নীরবে বসে কি যেন ভেবে চলে। সামনে তার ভবিষ্যৎ, পিছনে ফেলে-আসা নোংরা জীবন, ঘৃণ্য পরিবেশ—সেখান থেকেও সে বিতাড়িত। জাতিদ্রোহী সামাজদ্রোহী সে···তবু জোর করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হবে তাকে। ভাবে,

ডান্‌কান সাহেবের বোতল আর গেলাসগুলো সত্যই চমৎকার, বেলোয়ারি ঝাড়টা মনোরম। লালচে রংএর বিদেশী মদটা সারা মন হালকা করে দেয়। বাতাসে দোল দিয়ে যায় লালচে ক্যানাফুলের স্তবক,···রজনীগন্ধার গন্ধ মাতাল করে তোলে···রেডিওটা থেকে একটি মেয়ের কামনামদির কণ্ঠস্বর আকাশকে ভারী করে তুলেছে। কে

জানে হেডউড সাহেবের সন্ধানের মেয়েটির গলা কেমন…রংটা ফর্সা…,মাথায় একরাশ কোঁকড়ান চুল…ডাগর চোখদুটো…বলিষ্ঠ পুরুষ্ট গঠন।

…হ্যাঁ,…দরকার হয় এগোতে হবে।

Mr. Duncan অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে, Sure !

কতকগুলো টাকা দিয়ে দেয় লোকগুলোর হাতে। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায় লোকগুলো।

…বিড় বিড় করছে চাঁদ…

মিঃ ডান্‌কান…সুরযপ্রসাদের কাটা কাটা কথাগুলো নেশার ঘোরে তার কানে আসে। চীৎকার করে ওঠে—

সুন্দর মাঝি ! ঠিক বলেছ সাহেব। Damned শূয়ার !

চমকে ওঠে মিঃ ডান্‌কান, পরক্ষণেই ফিরে চায় ঘরের দিকে। নিশ্চিন্ত হয় সে। না, চাঁদ নেশার ঘোরে সোফায় ঢলে পড়েছে। বকে চলেছে,…নীল আলোটা বড় মিষ্টি। মেয়েটির গলা আরও মিষ্টি। সোফার মধ্যে কার যেন নরম স্পর্শ…রজনীগন্ধার গন্ধব্যাকুল কামনামদির রাত্রি।…চাঁদের চোখ বুজে আসে। মিসেস্ ডান্‌কান চেয়ে থাকে তার দিকে, Damned fool !

বিজাতীয় ঘৃণায় মিঃ ডান্‌কানের মুখ বিকৃত হয়ে যায়। তবু ওকে ওদের এখন দরকার।

…মায়িথানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিভিন্ন সাতাশীর প্রায় হাজার পাঁচেক সাঁওতাল জমা হয়েছে। ছেলেমেয়ে মাঝি মেঝেন এসেছে কাতারে কাতারে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ধ্বনিত হচ্ছে টিকারার শব্দ, সাতাশীর সঙ্কেত।

তেঁতুল বটগাছের প্রহরা ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরটা ভরে গেছে লোকে। আক্কলাম্বান চেয়ে থাকে জনসমুদ্রের দিকে। সোয়ীর রক্তে আজ মাতন লেগেছে। জনতাকে জানাতে হবে তাদের আগামী কাজের কথা, সুন্দরমাঝি আর মাতব্বর সর্দাররা শলা-পরামর্শ করতে ব্যস্ত।

তিনদিন মাত্র সময় আছে, তারপরই শুরু হবে নির্বাচন, ওদের জানিয়ে দিতে হবে সেই সংবাদ। স্বরযপ্রসাদের লোকজন এসেছিল··· তারা স্তম্ভিত হয়ে যায় জনতা দেখে। এরা চাঁদকে চেনে না—চেনে সর্দারকে, শুনেছে তাদের জাত-দলের ডাক। সাড়া দিয়েছে।

আক্কলাম্বানের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে···

জনসমুদ্র শান্ত নিস্তরঙ্গ হয়ে শুনে চলে তার কথা, ভাত-কাপড়-ওষুধ মিলাবার কথা, তাদের দিন বদলেছে সেই সংবাদ। সুন্দর মাঝি দুহাত তুলে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

···সোয়ীর কণ্ঠস্বর শুনে সুন্দর মাঝি উদগ্রীব হয়ে উঠতে থাকে, হ্যাঁ রাঙা সর্দারের মেয়ে বটে, তেজ যাবে কোথায়! জনতা বলতে থাকে—সর্দারের ছেলের বৌ!

সুন্দর অজ্ঞাতসারেই কখন জোড়ের ধারে এসে পড়েছিল জানে না, অপেক্ষাকৃত নির্জন এই দিকটা। উঁচু টিলার নিচু দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে নদীটা, হঠাৎ পিছন থেকে একটা পায়ের শব্দ শুনেই ফিরে চাইল।

···লোকটার অতর্কিত আক্রমণ ঠেকাতে পারে না সর্দার। লাঠির ঘায়ে পড়ে যায় আর্তনাদ করে। দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে, চোখের সামনে সারা পাহাড় বনভূমি পাক খেতে থাকে; ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসে সবকিছু।

তাজা রক্তে শক্ত মাটিটা ভিজে ওঠে: আর্তনাদ শুনে কারা ছুটে আসছে, লোকটা টিলার আড়ালে একটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আহত সর্দারের মাথাটা সোয়ী কোলে তুলে নেয়। তার চোখে দীপ্যমান জ্বালা। সমস্ত ডুংরি ভরে ওঠে জনতায়। এর শোধ:তারা নেবে।

আব্দুলাস্থান বলে চলেছে,

ওরা জানে ওরা হেরে যাবে। তোমাদের শক্তিকে ধাপ্পা দিয়ে কুলোতে পারছে না—তাই এই নোংরামি করবেই। কিন্তু এর জবাব ওদের দুচারজনকে মেরে হবে না, ওদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। জয় আমাদের হবেই। অন্যায়ের প্রতিকার আমরা করবই করব।

…চাঁদকে শোনান হয় না সংবাদটা। সে ডান্‌কান সাহেবের বাংলোতে একরকম নজরবন্দী হয়েই রয়েছে। সূরযপ্রসাদ বাবু ডান্‌কান সাহেব—আরও দু একজন ম্যানেজার গোপনে কিসব পরামর্শ করে চলেছে।…শেষ অস্ত্র ব্যবহার তাদের করতে হবে। দরকার হলে তাই করবেন তাঁরা।

মায়িথানের প্রান্তরে পরিত্যক্ত গোহাটায় পোলিং সেণ্টার হয়েছে। আশেপাশের ডুংরীতে মাঝি মেঝেন আর ধরে না, মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে সুন্দরমাঝি শুয়ে শুয়েই লোকজনকে ডাকিয়ে কথা বলছে। সোয়ী রয়েছে তার সেবায়। আজ সুন্দর মাঝির মন ভরে ওঠে—না থাক তার ছেলে…সোয়ীই সে অভাব পূর্ণ করেছে।

…দলেদলে সাঁওতাল এসেছে দু চারটে কলিয়ারি থেকে…কামিনরা এসেছে সূরযপ্রসাদের ধানকল থেকে…হাট থেকে এসেছে দিনমজুর মাঝিরা। আব্দুলাস্থান ভাবতেই পারেনি…শেষ পর্যন্ত এই আঘাত দেবে ওরা। মালকাটাদের সর্দার বলে চলেছে,

বলেছে উরো, উরা যদি জেতে তাহলে আর আসতে হবেক নাই। কারখানা আমরা বন্ধ করে দুব।

কামিন মেয়ে একজন ছোট ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, বলে ওঠে সে, হিঁ বাবু, বুলেছে উদিকে জিতিয়ে দিলে ধানকলে ঢুকে আর কাজ দুব নাই। কি খাওয়াব ইদিকে বলো তুমি ?

কল-কারখানা ওদের হাতে, তাই বলে স্বাধীন মতামত দেবার উপায় রাখবে না এই বেচারীদের। সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আক্লাস্থানের। বলে সে, আমরা জিতলে জোর করে আমরাই উদের কল দুব।

পারবি তুরো ?

আলবৎ!

লোকগুলোর মুখে দেখা দেয় হাসির আভা। কোন আইন নাই ওদের দূর করে দেবার।

কাল তাহলে ভোর বেলাতেই আসব কিন্তু।

বাধা দেয় আক্লাস্থান—না, কাচ্চা-বাচ্চা লিয়ে তিনকোশ পথ আজ আর যাসনে তুরা, চাল ডাল আছে—লিয়ে ফুটিয়ে খা। খাটবি, খেতে দিতে উরা পথ পাবেক নাই!

...ওরা নিশ্চিন্ত হয়।

রাত্রি নেমে আসে...মিঃ ডান্‌কান শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজাররা সুরযপ্রসাদ বাবু পরামর্শ করছে। থানা থেকে দারোগা সাহেবও এসেছেন—

Risky ব্যাপার! জানেন তো...Govt. চায় fair election হোক...

শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা একটু বিরক্তই হয়।

টিলার উপর থেকে দেখা যায়, দূরে পাহাড়ের গায়ে অতল অন্ধকার ভেদ করে জলে উঠছে হাজারো মশালের আলো।...সাঁওতাল ওঁরাওদের চীৎকার নিথর রাত্রি ভেদ করে কানে আসে, কানে আসে টিকারার গুরু-গুরু ধ্বনি। বনপাহাড় ভেদ করে মত্ত উল্লাসে আসছে ওরা,

জমায়েত হচ্ছে পাহাড়তলীর ডুংরীতে। ওরা কেউ চেনে না এই শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের—চেনে না কেউ চাঁদকে।

উত্তেজিত সাঁওতাল ওঁরাও জনতা রাত্রির অন্ধকারে মারমুখো হয়ে ওঠে। অনেক সহ্য করেছে তারা—আহেরিয়ার দিন ওই সাহেবদেরই একজন গুলি করে মেরে গেল তাদের ডুংরীর এক ভাইকে। কতদিন আরও কত অত্যাচার নীরবে মাথা পেতে সহ্য করে এসেছে। আজ তাদের সর্দারকে চোরের মত মেরে যাবে তাদেরই ডুংরীর পাশে এসে, নীরবে এই অত্যাচার ওঁরাওরা সহ্য করবে না! বল্লমের ধার তাদের ভোঁতা হয়ে যায় নি, বিষকাঁড়ের জোর একটুও কমেনি তাদের। ওরা গুলি করবে—করুক। মরতেও তারা ভয় পায় না। তবু জবাব দেবে এই অত্যাচারের, চাঁদকে আজ তারা ছেড়ে দেবে না, বনের মধ্যে শালগাছে বেঁধে রেখে দিয়ে আসবে, রাত্রির আঁধারে নেকড়ে না হয় ভালুকে চিরে ফালা ফালা করে দেবে ওর দেহ। মশালের আলো আর পাহাড় চূড়ায় টিকারার গুরু-গুরু শব্দ, ওদের চীৎকার—সবকিছু মিলে নৈশ অন্ধকারে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

আরুলাম্বান সামলাতে পারে না, তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর পৌঁছায় না এতদূর। ক্ষিপ্ত জনতা চীৎকার করে উঠে—

কুন কথা আমরা শুনব নাই, শ্যাষ দেখে লুব আজুকে!

জনতার কল্লোল হঠাৎ থেমে যায় সোয়ীর কাঁধে ভর দিয়ে সুন্দর মাঝিকে আসতে দেখে। বুড়ো হাত তুলে তাদের শান্ত করবার চেষ্টা করে।

আরুলাম্বান বুড়োর কথাগুলো চীৎকার করে শুনিয়ে দেয় সমবেত জনতাকে—

কাল দিনের বেলাতেই এর জবাব তোমরা দিতে পারবে। তীরকাঁড় ছুঁড়ে এর জবাব দেওয়া হয় না, জবাব দেওয়া হবে যদি আমরা জিততে পারি। আজ তোমরা চুপ করে থাক—

সর্দারদের চীৎকারে গোলমালটা খানিকটা বন্ধ হয় আপাততঃ, কিন্তু রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত তারা ফুঁসতে থাকে মনে মনে।

মিঃ ডান্‌কানের বাংলোর জোরালো আলো ম্লান হয়ে আসে। কয়েকজন বিভিন্ন কলিয়ারির ম্যানেজার, সূরযপ্রসাদ বাবু, আরও লোকজন রয়েছে। ও পাশের ঘরে চাঁদ ঝিম মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজেদের কলিয়ারির সর্দার কজন ডাকিয়ে বলে চলেছে তারা—

টুম লোককো ভারী ইনাম মিলেগা—

একজন সর্দার বলে ওঠে, কুছ মালুম নেহি হোতা হ্যায় সাব্ শালা লোগ্ ক্যা করেগা!

তুম কাহেকো তলব খাতা হ্যায়! গর্জন করে ওঠে সূরযপ্রসাদ বাবু। জাহির করে চলেন নিজের বীরত্ব।

Drive them all out, sir! নিমকহারামকা বাচ্চা!

সর্দার কজন নীরবে নেমে গেল বাংলো থেকে। দূর থেকে সূরযপ্রসাদের দিকে চায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে। ওরাও যে আজ বদলে গেছে, ডান্‌কান সাহেবের চোখে এই পরিবর্তনটা ভাল ভাবেই পড়ে।

রাত্রির অন্ধকারে দেখা যায় বাংলোর বারান্দা থেকে দূর দিগন্তে আকাশজোড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়-সীমা, মশালের শত সহস্র আলোক-শিখায় বন পাহাড়ের বুক ভরে গেছে। ওদের চীৎকার ভেসে আসে নৈশ বাতাসে। ডান্‌কান আজ রাত্রেই আভাস পায় দিন বদলেছে, ওরা আজ নিজেদের কথা প্রকাশ করবার ভাষা পেয়েছে, এবং এর ভবিষ্যৎ ফল কি তা সে জানে।

নীরবে পায়চারি করতে থাকে বারান্দায়। পিছনে মেম সাহেবের ডাক শুনে ফিরে চাইলেন।

Bill!

Yes, darling.

What's wrong ?

সত্যিই ডান্‌কান সাহেব আজ মনে মনে হার স্বীকারই করেছে। এতদিনের সমস্ত প্রাণপাত চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে। বুড়ো সুন্দর সর্দারকে গুরুতরভাবে জখম করবার আদেশ সে দেয়নি, তবু যখনই ওর সংবাদটা কানে আসে তখনই বুঝেছিল এর ফল কী হবে! এতবড় অপমান নীরবে সইবে না তারা! ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহের ভার ডান্‌কান সাহেবের কাছে যেন বোঝা হয়ে উঠেছে।

I am too tired, darling !

কাঁচের সার্সির ওপারের আকাশে কালো জমাট অন্ধকারে দু'একটা তারার ঝিকিমিকি। ডান্‌কান সাহেবের চোখের সামনে ভেসে ওঠে··· নর্দামটনশায়ারের এক পল্লীপ্রান্তে উইলো এলম্ গাছের পাতায় পাতায় দিনশেষের আলোর ঝলকানি,···লেকের ধারে ছিপ হাতে ট্রাউট মাছ শিকারের দিনগুলো,···আবছা কুয়াসায় ঢাকা মিষ্টি সন্ধ্যারাতের হিমেল বাতাস—

Darling, I want to go back to our home ! I shall write to-morrow to the head office for my pension !

Yes Bill, It will be nice to be in our home again ! How good of you to think so !

শান্ত কোমল পরিবেশ, নারীর সেবা আর শান্ত গৃহকোণ !

ডান্‌কান সাহেব আজ চায় জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যেতে ! শান্তি, নিশ্চিন্ততা আর অবকাশ।

আজ প্রায় তিরিশ বছর আগে সে পা দেয় এখানকার মাটিতে, নিউক্যাসলের ওদিকে কয়লার খনিতে কিছুদিন এ্যাপ্রেনটিস থাকবার পরই আসতে হয় ভাগ্যবিতাড়িত হয়ে দূর কলোনীতে রুটির সন্ধানে।

সম্পদভরা দেশ তাকে শুধু রুটিই দেয় নি, দিয়েছিল আশ্রয়, প্রাচুর্য—সম্মান। কিন্তু বিনিময়ে কী দিয়েছে এই মাটিকে, এই মাটির মানুষকে? চাবুক মেরে পিঠ চিরে দেখেছে এদের রক্তের গাঢ়তা; কলিয়ারিতে আগুন লাগলে অন্য সিমগুলো বাঁচাবার অজুহাতে মালকাটার দল সমেত তাদের ফায়ার ব্রিক দিয়ে গেঁথে রেখে জ্যান্ত রোস্ট করতেও কসুর করে নি। সে চলে গেলে কেউ দুঃখও করবে না!

Darling!

ডান্‌কান সাহেবের ডাকে মিসেস্ সাড়া দেয়—**Yes dear!**

সাহেবের যেন ঘুম আসে না, মাথাটা দপ্ দপ্ করছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে…,একখানা মুখ। বহুদিন আগে বরাকর স্টেশনে দেখেছিল তাকে—ফাদার ব্রুমফিল্ড। সেও তারই জাত, তবে তার বিদায়ের দিনে কেন শত শত সাঁওতাল ওরাঁও চোখের জল ফেলেছিল, অশ্রু মুছেছিল ওই বিদ্রোহী আরুলাম্বানও!

ডান্‌কান জানে না কোন্ মহান আলোকের প্রদীপশিখায় ওদের অন্তর জ্বালিয়ে এসেছে ওই ব্রুমফিল্ডের দল। ওরা এসেছিল ভালবাসতে, মানুষের সেবা করতে, নিজেকে বিলিয়ে দিতে। আর ডান্‌কানের দল এসেছিল ঘৃণা করতে, লুঠ করতে—নিজের পুঁজি বাড়িয়ে নিয়ে যেতে। তাই ওরা পায় সম্মান, ভালোবাসা, আর এরা পায় শুধু ঘৃণা আর অপমান।

পাহাড়ের নিচে লেক গ্রেয়রের জলের ধারে উইলো-ছায়ায় বসে রয়েছে ছিপ নিয়ে ডান্‌কান…পেগি পাশেই বই পড়ছে…ঝিকিমিকি করে পড়ন্ত রোদ জলের বুকে; দু'একটা 'গাল্' লেকের জলে ছোঁ মেরে যায়…বাতাসে একটা মিষ্টি তাজা গন্ধ। তার দেশ…

উপায় থাকলে আজই হয়ত ডান্‌কান যাত্রা করত এইখান থেকে তার দেশের উদ্দেশ্যে। সারা মন যেন কেমন করে!

চুলোয় যাক চাঁদ, কালই তাকে দূর করে দেবে। যা হবার হবে। ওকে রেখে আর কী দরকার ?

চাকা ঘুরে চলেছে। সময় এবং ভাগ্য যারা মানে না তারা স্বীকার করবে, উপরতলা যেমন নীচে আসে তেমনি নীচু তলার যারা উপরে একদিন যায়ই। যে জীবনে চাঁদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কি করে কোন অসতর্ক মুহূর্তের এক ধাক্কায় নীচে নেমে এসেছিল ; টের পেল সেইদিন যে দিন বুঝল পিছনের সব দরজাই বন্ধ। মিঃ ডান্‌কান চলে গেছে। ডেজিও নাই মিশনারী হোমে। শেষদিন দেখা করতে গিয়েছিল ফাদার হেডউডএর নতুন ডালকুত্তা তাকে তাড়া করে এসেছিল, মালি, সাহেব, ডেজি কেউ ধরে নি কুকুরটাকে। সাহেব আর তাকে ঢুকতে দেয়নি হোমে। ডুংরীতেও ও ফিরে যায় নি।

শতশত মাঝিকে পাঠিয়েছিল সাহেব জোর করে মাটির অতল অন্ধকারে,...চাঁদই এনেছিল তাদের। আজ চাঁদকেও তাদের মত ডুংরী ছেড়ে বার হতে হয়েছে অন্নের সন্ধানে।

ফুকনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বরাকর বাজারে জনসমুদ্রের মধ্যে। ডুংরি থেকে গাড়ীতে করে ধান আলু বেচতে এসেছে।

সমস্ত চেহারায় কেমন একটা শান্ত সমাহিত ভাব, চোখে মুখে একটা স্থিরতা। চুলগুলো অযত্নবর্ধিত হয়ে ঘাড়ের নিচে ঝুলে পড়েছে।

চাঁদকে দেখে এগিয়ে আসে হাসিমুখে। চাঁদ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

—ঘর যাবি নাই ?

নীরবে চাঁদ কি যেন ভাবছে। যাবার মুখ তার নাই। সোমীর খবর জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, কোথায় আছে কেমন আছে। কিন্তু পারেনা।

...মনে পড়ে একদিন ফুকন তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল কাঁড়া লড়াইএর আসরে...ইচ্ছা করলে সোয়ীর ভবিষ্যৎ স্বামীর জীবন শেষই করে দিতে পারতো সেদিন।

কিন্তু তা করেনি।

আজও সোয়ীকে তেমনি সহজ ভাবেই ক্ষমা সে করেছে তাকে ভুলতে চেয়ে।

...সন্ধ্যার আগে সহর থেকে চলে গেল ফুকন গাড়ীখানা জুড়ে নদীর ধারের কাঁচা পথটা বেয়ে বনের দিকে...তার বাঁশীর স্বর ভেসে আসে। অবচেতন মনের না-পাওয়ার ব্যথা বেদনায় স্বরটা করুণ হয়ে উঠেছে।

বিপরীত দিকে যাত্রা করেছিল চাঁদ অদৃষ্টের হাতছানিতে। সব যেন বেসুরো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তার জীবনে।

কি করে লোহা-কারখানায় এসেছিল ঠিক জানেনা চাঁদ, আজ সেইখানে রয়ে গেছে। কালো বেমানান একটা প্যাণ্ট...ট্যান্‌ড্‌ বুট আর কালিমাখা চামড়ার দস্তানা হাতে জীর্ণ দেহখানিকে টানতে টানতে বার হয় কারখানা থেকে। সে চাঁদের সঙ্গে আগেকার চাঁদের কোন সম্পর্ক নাই।

...সিনেমা গ্রাউণ্ডে সেদিন বহুলোকের ভিড়। কুলি, সর্দার, চার্জহ্যাণ্ড সকলেই ভিড় করেছে। চাঁদও গেছে। অস্পষ্ট আলোতে দেখা যায় অসংখ্য জনতা...উৎসুক হয়ে কার বক্তৃতা শোনে!

টারবাইনের একটানা স্পন্দন ধ্বনি,—ব্লাস্টফার্ণেসের ক্রুদ্ধ গর্জন, স্লাগের চোখ-রাঙানির চেয়ে গভীর সঙ্কেতময় সে ভাষা। চাঁদ

যেন স্বপ্ন দেখছে। দূরে কয়েকটা বিজলী আলো। গলায় একরাশ ফুলের মালা…কালো শীর্ণ চেহারা, লোকটা বলে চলেছে। পাশে বসে আর একটি চেনা মুখ। অতি পরিচিত কান্না।

কম্পিত পদে জনতার মধ্য থেকে বার হয়ে যায় চাঁদ। ঐ জীবন তো বাস্তব ছিল তার …আজ কোন নিশীথের দেখা স্বপ্ন, যা কোনদিন সত্য ছিল না—হবেও না।

মদের দোকানটা শূন্য, সকলেই মিটিংএ গেছে। দোকানদারই এগিয়ে আসে চাঁদের দিকে। আজ সব ভুলতে চায় চাঁদ, নিজের জীবনের সব গ্লানি পরাজয় আজ বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দিতে চায়।

…রাত্রি হয়ে আসে…চাঁদের পা দুটো টলছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

…ছায়াচ্ছন্ন কাঁইজোড়ের ধার…

সোয়ী…তার ডাগর কালো চোখের চাহনি…পাহাড়-কোলে পড়ন্ত আলোয় জাফরানী রংএর মেঘের ভেলায় সোনার দিন ভেসে গেল।… চোখের সামনে ফুটে ওঠে…জনতা…কার দীপ্ত দুটো চোখ…সমস্ত বাধা বিপত্তির উর্ধ্বে শোনা যায় জাগরণের বাণী! আক্লাম্বান… আর সোয়ী।

এ্যাই…ও…ওই!

মত্তপকণ্ঠে কার তর্জন ভেসে ওঠে নৈশ বাতাসে। ক্লান্ত পা দুটো দেহখানাকে বইতে পারে না। রাস্তার ধারে একটা সোঁদাল গাছের ধারে বসে, ক্রমশঃ সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

হঠাৎ মুখের উপর একটা গাড়ির একঝলক আলো পড়তেই চমকে উঠে চাইল—সোয়ী! বক্তৃতা দিয়ে তারা ফিরে চলেছে। আক্লাম্বান কি যেন ভাবছিল, সোয়ীকে চমকে উঠতে দেখেই ফিরে চায়।

এক মুহূর্ত। রাস্তার ধারে মত্তপ একটা লোকের অচেতন দেহ···একদিন যাকে বনের দেবতা বলে ভুল হত। আজ?···

আলোর ঝলকানিতে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় চাঁদ, হাত দিয়ে মুখখানাকে ঢেকে আবার শুয়ে পড়ে।

এক মুহূর্ত। গাড়িখানা বার হয়ে গেল। সোয়ী চুপ করে বসে থাকে। যে গেছে যাক। তাকে খুঁজতে গেলে দুঃখই পাবে সে। তবু একফোঁটা জল অজ্ঞাতসারেই তার জন্য গড়িয়ে পড়ে, বুক দীর্ণ করে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

শালপিয়ালের বনের শান্ত পরিবেশে উঠেছিল ঘূর্ণি ঝড়—ঝরে গেল জীর্ণ পাতা আর মরা ডাল।

নূতন শাখায় দেখা দেয় নব কিশলয়···শালফুলের গন্ধমদির বাতাস চাঁদের আলোয় মন্থর হয়ে ওঠে। আসে বর্ষা শরৎ হেমন্ত, ঋতুচক্রের সমারোহে আসে বসন্ত। বনভূমি মুখর হয়ে ওঠে মিলনের মধুরিমায়।

···ডুংরীতে ওঠে গানের সুর।

শালপিয়ালের বন মহুয়া ফুলের সুবাস বুকে নিয়ে কার আগমন প্রতীক্ষা করে।